৫৬তম বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
১৩৯০

রামধনু

সম্পাদক : শ্রীযুক্ত ইন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

আভা

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

জাতীয় সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয় এমন লেখক লেখিকা এবং নূতন লেখক-লেখিকার রচনা প্রকাশের বিশেষ সুযোগ আছে।

সম্পাদিকা—রেখা চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক—ডাঃ গোবিন্দদাস চট্টোপাধ্যায়

বার্ষিক মূল্য ১২ টাকা (সডাক)। প্রতি সংখ্যা ১-২৫ টাকা।

৭৩সি, শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২৬।

উৎসবের দিনে সমর চট্টোপাধ্যায়ের নানা বয়সের জন্য লেখা নাটক নাটিকা বেছে নাও। সি-এল-টিতেই পাবে।

শিশুরংমহল, কলকাতা-২৯

ফোন ৪৬-১২০০

১২ বছরের উর্দ্ধে

অবন পটুয়া—মুগলী
লাল নূপূর—যাদুকরের দেশে
লালচে বুড়ো—রূপলেখা
রূপবর্দ্ধন—বাহাদুর দা ॥

১২ বছরের নিম্নে

মিঠুয়া—সুমন্ত
জিজো—কনকবংশী
সাত ভাই চম্পা—অর্কেষ্ট্রা
পিক্‌নিক্—সাধু
নীল সাগরের নীচে ॥

৯ বছরের নীচে

কাঠবেড়ালী—ঝগড়াটে পড়ুয়া
দুষ্টু ইঁদুর—ফালতু বাঁশের টুকরো—
স্বপন দেখি রাতের বেলা ॥

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫, কালীতারা প্রেস থেকে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক ১৯৮২-৮৩ সালের জন্য অনুমোদিত সাময়িক পত্রিকার তালিকাভুক্ত (বিজ্ঞপ্তি নং ৬৩৬ (১৬) টি. বি. সি. ২এ-২টি/৮১, ৪ঠা আগষ্ট ১৯৮২)

৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য স্মৃতিরঞ্জিত

সম্পাদক ঃ অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ঃ ঃ সহযোগী সম্পাদিকা ঃ অধ্যাপিকা ডক্টর সুচেতা মিত্র

৫৬তম বর্ষ **১৩৯০** **৩য় সংখ্যা**

রবীন্দ্রনাথ

পলাশ মিত্র

তোমাকে পড়ে মনে ঃ
চুপটি ক'রে যখন বসি ঘরেরই এক কোণে।
যখন দেখি কাঁপছে পাতা, ওই বয়ে যায় নদী
তখন ভাবি এই সময়ে থাকতে তুমি যদি।
যখন দেখি বৃষ্টি পড়ে, নদেয় আসে বান,
নৌকো নিয়ে ছেলেরা গায় শিবঠাকুরের গান
তখন শুধু তোমায় ভাবি, তোমাকে পড়ে মনে
চুপটি ক'রে যখন বসি ঘরেরই এক কোণে।

যখন দেখি ধর্ম নিয়ে মানুষ লড়াই করে,
আচার-বিচার তৈরি ক'রে নিজের মতো গড়ে,
চারিদিকেই হিংসা এবং অজানা সংশয়
পদে-পদেই মানবতার বিষম পরাজয়ঃ

তখন শুধু তোমায় ভাবি, তোমাকে পড়ে মনে
চুপটি ক'রে যখন বসি ঘরেরই এক কোণে।

শ্রীগৌরী দেবী

আমার বড় নাতনী অনেক দিন আগে কোথা থেকে একটা ছড়া শিখে এসে প্রায়ই আমাদের শোনাত ঃ

টিকটিকি গিরগিটি দু'জনেই বি. এ, বি. টি,
হাসে শুধু মিটিমিটি, ইংলিশে লেখে চিঠি।

নাতনী এখন বড় হয়েছে, কলেজে পড়ছে, কিন্তু তার সেই মজার ছড়াটি আমরা এখনও ভুলি নি।

আমার স্বামী বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ঠিক প্রাণিবিজ্ঞানী না হলেও ও-বিষয়ে তাঁর বেশ উৎসাহ আছে। বলা বাহুল্য টিকটিকি গিরগিটির যে সব গুণের কথা ঐ অজানা কবি বর্ণনা করেছিলেন তার কোন সন্ধান তিনি পান নি, তবে ওদের অন্য গুণের কথা তিনি জানেন। টিকটিকি তো আমরা ঘরে, দেয়ালে সর্বদাই দেখছি, কিন্তু গিরগিটি ? না, ওরা মানুষের ঘরে থাকে না, জঙ্গলই ওদের প্রিয় স্থান। তবে সময় সময় বাগানের আনাচেকানাচেও ওদের দেখা যায়। ওরা আকারে টিকটিকির চাইতে অনেকটা বড়।

গিরগিটি হরেক রকম জাতের আছে, সকলের কথা আজ আর বলা যাবে না,

তার চেয়ে বরঞ্চ একটি বিশেষ জাতের গিরগিটির কথা আজ বলি। এদের ইংরেজিতে বলে "ফ্রিল্‌ড্‌ লাইজার্ড"। ফ্রিল্‌ মানে গলার চারপাশে ঝোলানো ঝালর। কোন কোন ফ্রকের গলার দিকে লেসের ঝালর লাগানো থাকে দেখেছ তো, এও ঠিক তাই। এই গিরগিটিগুলোরও ঘাড়ের কাছে ঐ রকম একটা করে ফ্রিলের মত ঝালর লাগানো থাকে।

অদ্ভুত চেহারার গিরগিটি

এরা কিন্তু আমাদের দেশের বাসিন্দা নয়, থাকে আফ্রিকায়। তাও আবার মরুভূমির কাছাকাছি জায়গায়। আকারে বেশ বড়, খাড়া হয়ে দাঁড়ালে তিন ফুট বা এক মিটারও ছাড়িয়ে যাবে।

সাধারণ অবস্থায় ঐ ঝালর বা ফ্রিল্‌টা গলার চারপাশে ঝুলে থাকে, কিন্তু রাগলে বা উত্তেজিত হলে সেটা শক্ত হয়ে গলার চারদিকে খাড়া হয়ে ওঠে। এমনিতেই জানোয়ারটা দেখতে একটু বীভৎস, ঐ অবস্থায় তখন ওকে আরো বীভৎস দেখায়। ওদের গলার ভিতরটা টুকটুকে লাল, হাঁ করলেই দেখা যায়। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, লেসের ঝালর খাড়া করে, মুখব্যাদান করে যখন দাঁড়ায় তখন সে চেহারা দেখলে অনেকেরই পিলে চমকে উঠবে। তার ওপর ওরা আবার প্রচণ্ড জোরে শিস্‌ও দিতে পারে। সেটাও বেশ ভয়-পাওয়ানো আওয়াজ।

আসলে কিন্তু জানোয়ারটি মোটেই হিংস্র নয়, আত্মরক্ষার জন্যই নাকি ওদের ঐ বিকট রূপ দেখানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই গিরগিটিগুলির আর একটা গুণ, এরা দু'পায়ে খাড়া হয়েই দারুণ জোরে ছুটতে পারে।

পাহাড়ী নদী যখন চিক্‌চিকে বালির ওপর দিয়ে তর্‌তর্‌ করে বয়ে যায় তখন কি কখনও ভেবে দেখেছ ঐ বালিগুলো কোথা থেকে এল ?

মাটি হলেই তো আর তার মধ্যে বালি থাকবে এমন কথা নেই, ঐ বালি নদীর স্রোতের সঙ্গেই চলে এসে সারা পথে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সে বালিই বা তৈরি হ'ল কি করে ?

কতক তৈরি হয় বেলে পাথর থেকে। জলের স্রোতের ক্ষমতা অসীম। পাথরকে ক্রমাগত আঘাত করে করে সে ক্ষইয়ে দিতে পারে আর সেই ক্ষয়-হয়ে-যাওয়া

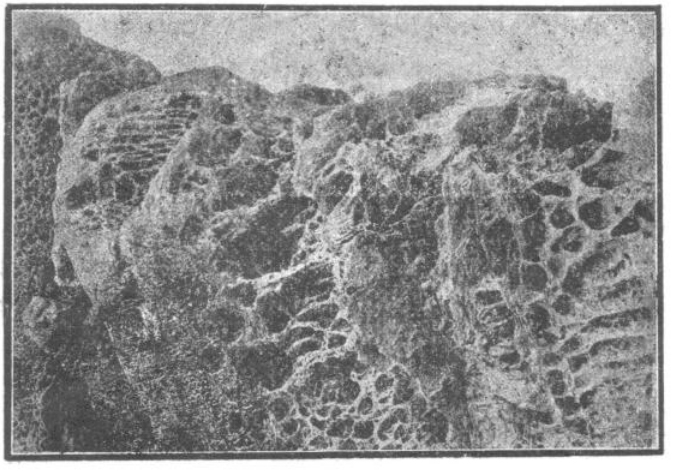

জলের তোড়ে পাথরও ফোঁপরা হয়ে যায়

পাথরই হচ্ছে বালি। তাই বলে মনে ক'র না এই ক্ষয় করা কাজটা একদিনেই হাসিল হয়ে যায়। হাজার হাজার—এমন কি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অতি ধীরে ধীরে পাথর ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে সূক্ষ্ম বালির কণায় পরিণত হয়, পাথরটাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যেতে থাকে ফোঁপরা। এ রকম ফোঁপরা পাথর কি তোমরাও দেখ নি ? ওর একটা ছবি দিলাম, মিলিয়ে দেখ তো এ রকম পাথর কখনও দেখেছ কিনা ?

* * *

আগে আমাদের দেশে লম্বা চেহারার মেয়ে বড় একটা চোখে পড়ত না, এখন হামেশাই চোখে পড়ে। স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে, স্বামীর চেয়ে স্ত্রী ছ' ইঞ্চি, এমন কি তারও বেশি লম্বা, এমনও দেখেছি। তবে সেটা ব্যতিক্রম।

আমি একবার একটি সাত ফুট লম্বা মেয়েকে দেখেছিলাম, তিনি একটা কলেজে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। অত্যধিক লম্বা হওয়ার দরুণই হয়তো মেয়েটির আর বিয়ে করা হয় নি। মানানসই চেহারার বরের অভাবেই হয়তো।

তবে এ সব সত্ত্বেও মেয়েদের চেয়ে সাধারণতঃ ছেলেরাই বেশি লম্বা হয়, প্রকৃতিরই নিয়মে। আচ্ছা, কত লম্বা লোক দেখেছ? আমি সাড়ে সাত ফুট লম্বা একটি লোককে দেখেছিলাম। তার বাড়ি ছিল ত্রিপুরা। সে যখন কলকাতার রাস্তায় বেরোত লোকে দৈত্য ভেবে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত।

এ পর্যন্ত ন'ফুট লম্বা লোকের কথাও শোনা গেছে। তবে পাশে যে ছেলেটির ছবি দেখছ ও ততটা লম্বা নয়, ওর উচ্চতা আট ফুটের সামান্য একটু বেশি। যে দরজিটি উঁচু দিকে মুখ করে, ওর দিকে তাকিয়ে, ওর জামার মাপ নিচ্ছে সে কিন্তু তোমার আমার মতই একজন সাধারণ চেহারার লোক। লম্বায় হয়তো সাড়ে পাঁচ ফুট কি আর একটু বেশি হতে পারে। কিন্তু ছেলেটির পাশে তাকে বামন বলেই মনে হচ্ছে।

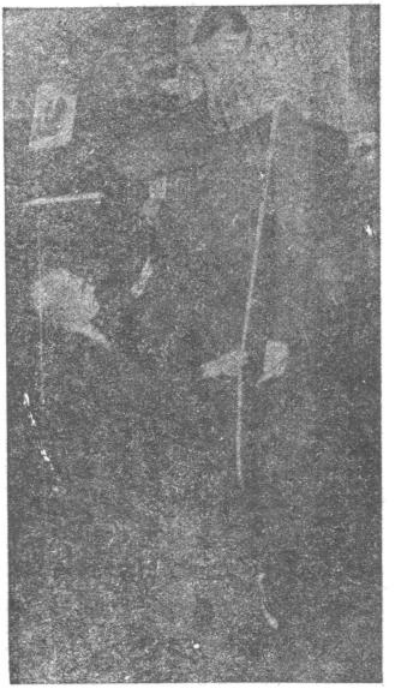

লম্বায় আট ফুট

* * *

মাছেরা যত ডিম পাড়ে তার সবই যদি ফুটে বাচ্চা হ'ত আর সে বাচ্চা পরে আরও বাড়ত তা হলে পৃথিবীর নদনদী, সমুদ্রে তাদের জায়গা দেওয়াই হ'ত এক সমস্যা।

এখন বর্ষাকাল, ইলিশের সময়। আমরা কিন্তু যথেষ্ট ইলিশ পাই না। অথচ একটা ইলিশ মাছ একবারে ডিম পাড়ে প্রায় ১? লক্ষ। ঐ রকম অন্য মাছেরা কে কি রকম ডিম পাড়ে শোন ঃ

হেরিং—একবারে ৫০ হাজার, কড্—একবারে ৮০ লক্ষ, আর লিঙ—একবারে প্রায় ৩ কোটি। এদের বেশির ভাগই কিন্তু বাঁচে না, কতকগুলি ডিম অবস্থায়, কতকগুলি আবার শূক অবস্থায়ই বিভিন্ন জলজীবের আহার হিসেবে শেষ হয়ে যায়।

শ্রীরঞ্জন চক্রবর্তী

ক্রিকেটে ভারতের বিশ্বজয়

এবারকার সবচেয়ে বড় খবর, ক্রিকেটে ভারত বিশ্বজয়ীর সম্মান নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। আমরা, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় টেলিভিশনের সামনে বসে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সেই ঐতিহাসিক ফাইনাল খেলাটি দেখে দৃষ্টি সার্থক করেছি।

খেলাটি হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে বিখ্যাত লর্ডস্ খেলার মাঠে। প্রতিযোগিতার নাম প্রুডেনশিয়াল কাপ্ টুর্নামেণ্ট। পৃথিবীর সব ক'টি বাছা বাছা দেশের ক্রিকেট টিম্ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল। টেস্ট ম্যাচের সঙ্গে এই খেলার তফাৎ—এই খেলাটি ৫ দিন ধরে চলে না—একদিনেই শেষ হয়। প্রতিটি দল বিপক্ষের বিরুদ্ধে ৬০ ওভার বল দিয়ে জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি করে।

প্রুডেনশিয়াল কাপ্ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ১৯৭৫ থেকে। তার চার বছর পরে ২য় খেলা হয় ১৯৭৯ সালে, এবং তারও চার বছর পরে এবার ১৯৮৩ সালে হ'ল তৃতীয় খেলা। ভারত অবশ্য তিন বারই যোগ দিয়েছে কিন্তু এর আগের দু'বারের ফলাফল তাদের পক্ষে মোটেই গৌরবজনক হয় নি। দু'বারের খেলায় তারা মাত্র একটি টিমকে (পূর্ব আফ্রিকা) হারাতে পেরেছিল। সেই ভারতই এবার সকলকে পর্য্যুদস্ত করে একেবারে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বেরিয়ে আসবে এ কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছিল? কিন্তু ভারতীয় দলের নতুন অল্ রাউণ্ডার অধিনায়ক কপিলদেব দেখিয়ে দিলেন যে সবাই যদি একপ্রাণ হয়ে খেলতে নামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে, তা হ'লে কোন অসাধ্য কাজই তাদের হার মানাতে পারে না।

এবারকার অন্যান্য প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্ (যারা এখন সবচেয়ে শক্তিশালী দল বলে কারো কারো ধারণা), ইংল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড, জিম্বাবুয়ে, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের ক্রিকেট দল। দু'টি বিভাগে প্রথমে লীগ পদ্ধতিতে খেলা হয়। অর্থাৎ ঐ বিভাগের প্রত্যেকটি দলকে পরস্পরের সঙ্গে দু'বার খেলতে হয়। তার পর পয়েণ্ট অনুযায়ী দু'টি বিভাগে মিলে দু'টি সেমিফাইনাল এবং সর্বশেষে হয় দু'টি সেমিফাইনালে বিজয়ী দল দু'টির মধ্যে ফাইনাল খেলা। এই ফাইনাল খেলায় যে দল জেতে তারাই হয় চ্যাম্পিয়ন।

ভারতের অধিনায়কের অপূর্ব দক্ষতার জন্যই এবার ভারত বিজয়ী হয়েছে—ক্রীড়া-অভিজ্ঞদের সকলেরই প্রায় এই মত। শুধু তাই নয়, তাঁর নেতৃত্বে ভারতের টিম্ ওয়ার্ক ছিল অনবদ্য। যেমন ব্যাটিং, তেমনি বোলিং আর তেমনি সুন্দর ফিল্ডিং। এই ফিল্ডিং সম্বন্ধে ভারত চিরকালই দুর্বল বলে

শুনে আসছিলাম, কিন্তু এবার স্বচক্ষে দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম। এত চমৎকার ফিল্ডিং করতে পারে ভারত! ফাইনাল খেলা দেখে আমার মনে হয়েছিল সমস্ত ভারতীয় দলটি যেন একাত্ম হয়ে খেলছে। জয় তাদের পেতেই হবে,—যে কোন ভাবে, এবং তাই তারা পেয়েছে।

কি করে ভারত ফাইনালে পৌঁছল তার একটু বিবরণ দিলে তোমাদের বোধ হয় ভালোই লাগবে।

প্রথম খেলায়ই ভারতকে খেলতে হয়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। এই খেলায় ভারত ৮ উইকেটে ২৬২ রান্ তোলে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তোলে মোট ২২৮। ফলে ভারত ৩৪ রানে জয়ী হয়। ভারতের যশপাল শর্মা এই খেলায় ৮৯ রান্ করেছিলেন। রবি শাস্ত্রী ও রোজার বিনি ৩টি করে উইকেট নেন।

দ্বিতীয় খেলা হ'ল জিম্বাবুয়ের সঙ্গে। জিম্বাবুয়ের ১০৫র বিরুদ্ধে ভারত ৫ উইকেটেই ১৫৭ করে ৫ উইকেটে তাদের হারিয়ে দিল। এই খেলায় সন্দীপ পাতিল অর্ধ সেঞ্চুরি রান্ তোলেন, মদনলাল ৩টে উইকেট পান।

তৃতীয় খেলায় কিন্তু পাশা ওল্টাল। ভারত অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ১২৬ রানে হেরে গেল। অষ্ট্রেলিয়া করল ৩২৬, ভারত মাত্র ১৫৮।

চতুর্থ খেলায় আবার হার। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ প্রথম বারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল ভারতকে ৬৬ রানে হারিয়ে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৮২ রান্, ভারত ২১৬ রান্। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রিচার্ড সেঞ্চুরি করলেন (১১৯ রান্)। ভারতের মহিন্দর অমরনাথ করলেন ৮০। তিনি পেলেন ৩টে উইকেটও।

পঞ্চম খেলায় ভারত আবার হারাল ফিরতি ম্যাচে জুম্বাবুয়েকে ৩১ রানে। ভারত ২৬৬, জুম্বাবুয়ে ২৩৫। কপিলদেব আউট না হয়ে একাই করলেন ১৭৫—যা নাকি এ পর্যন্ত প্রুডেন্‌শিয়াল কাপের রেকর্ড রান্।

ষষ্ঠ খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ফিরতি ম্যাচে ভারত ১১৮ রানে তাদেরকে হারিয়ে দিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠল। ভারত করল ২৪৭ রান্, অষ্ট্রেলিয়া ১২৯। মদনলাল আর বিনি দু'জনেই চারটে করে উইকেট পেলেন।

সেমি ফাইনাল। ভারতকে এবার খেলতে হবে দুর্দ্ধর্ষ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে। সবাই ভেবেছিল এবার কঠিন পরীক্ষা। কিন্তু দেখা গেল ভারত ইংল্যাণ্ডকেও অবলীলাক্রমে ৬ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছে। ইংল্যাণ্ড ২১৩, ভারত ৪ উইকেটেই ২১৭। যশপাল শর্মা ৬১ রান্ করলেন, পাতিল আউট না হয়ে ৫১। কপিলদেব ৩টে উইকেট নিয়ে নিলেন।

এর পর ফাইনাল—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে। সেদিন ভারত যে দাপটে খেলল তা তো নিজের চোখেই সবাই দেখলাম। প্রথমে ভারত ব্যাট করতে নেমে ১৮৩ রান করায় সকলেই একটু দমে গিয়েছিল, পারবে কি ভারত এই অল্প রানে অমন একটা বাঘা টিমের সঙ্গে এঁটে উঠতে? কিন্তু না, ১৪০ রানেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে মুড়িয়ে দিয়ে ভারত ১৯৮৩ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ্ ছিনিয়ে নিল ওদের হাত থেকে।

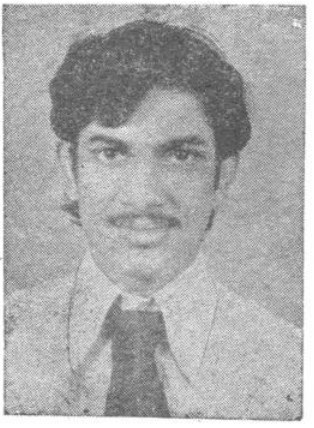

ম্যাজিকের আসর

পরিচালক : যাদুকর দীপক রায়

জীবিত বা মৃত

এবারে একটি নতুন ধরনের ম্যাজিক শিখিয়ে দিচ্ছি।

একটি মোটা কাগজ তিন ভাঁজ করে নিয়ে দর্শকদের সামনে ছিঁড়ে সমান তিনটি ভাগ কর। ঐ সমান তিন খণ্ড কাগজ তিনজন দর্শককে ডেকে দিয়ে দাও। তিনজন দর্শকের একজনকে তাঁর কাগজে কোন একজন বিখ্যাত মৃত ব্যক্তির নাম লিখতে বল। বাকি দু'জনকে তাঁদের কাগজে একজন করে বিখ্যাত জীবিত ব্যক্তির নাম লিখতে বল। তোমার নির্দেশ মত দু'জন তাঁদের কাগজে লিখলেন দু'জন জীবিত ব্যক্তির নাম, তৃতীয় ব্যক্তি লিখলেন একজন মৃত ব্যক্তির নাম। এবার প্রত্যেককে তাঁদের কাগজগুলো চারটি ভাঁজে ভাঁজ করতে বল, যাতে বাইরে থেকে দেখে বোঝা না যায় ভিতরে কি লেখা আছে। কাগজ তিনটি একত্রে জড় করে একটি টুপির বা কোন পাত্রের মধ্যে রেখে দিতে বল।

এবার একটি রুমাল নিয়ে কোন একজন দর্শককে দিয়ে তোমার চোখ কষে বেঁধে দিতে বল,—যাতে চোখবাঁধা অবস্থায় তুমি কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর ঐ কাগজের টুকরোগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে বল।

দর্শক নির্দেশ মত তাই করে দিলে তুমি টুপি বা পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটি কাগজের টুকরো বের করে এনে বলবে, এতে একজন বিখ্যাত জীবিত ব্যক্তির নাম লেখা আছে। দর্শক খুলে দেখবেন সত্যিই তাই, ঐ কাগজে একজন বিখ্যাত জীবিত ব্যক্তির নাম লেখা। তার পরেরটি বের করে বলবে এতে লেখা আছে একজন মৃত ব্যক্তির নাম। খুলে দেখা যাবে সত্যিই কাগজটিতে একজন বিখ্যাত মৃত ব্যক্তির নামই লেখা আছে। দর্শকেরা দেখে নিশ্চয়ই অবাক্ হয়ে যাবে, চোখ বাঁধা অবস্থায় কি করে তুমি ঠিক ঠিক বলে দিচ্ছ!

কৌশল : একটি মোটা কাগজ সমান তিন ভাঁজ করে হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়লে তিনটি সমান মাপের কাগজের টুকরোই হবে। প্রত্যেকটা টুকরো কাগজের চারটে

(বাকি অংশ ১১৩ পৃষ্ঠায়)

জয়দীপ ও বশীকরণ রুমাল

অজিতকৃষ্ণ বসু

ভোরবেলাই ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরাম এসে হাজির আমার বৈঠকখানায়। আদর করে বসিয়ে বললাম, "কাল আপনার ম্যাজিক দেখে ভারি খুশি হয়েছি মুন্‌শীরামজি! কিন্তু আজই সকালে আমার গরীবখানায় দেখা দেবেন ভাবতে পারি নি।"

মুন্‌শীরাম বললেন, "আসল ম্যাজিক দেখিয়েছে তো আপনার নাতি জয়দীপ। ডাকুন তাকে একবার। সেই তো আমাকে আজই সকালে টেনে এনেছে।"

কিন্তু ডাকতে হ'ল না। জয়দীপ আপনি এসে বলল, "গুড মর্নিং ম্যাজিশিয়ান।"

মুন্‌শীরামজি বললেন, "গুড মর্নিং জয়দীপ। আমাকে দেখে খুব অবা ক্‌হয়ে গেছ?"

জয়দীপ বলল, "মোটেই না। আমি তো জানতুম তুমি আসবে।"

"কি করে?"

মাথা নেড়ে জয়দীপ বলল, "বলব কেন? ওটাই তো আমার ম্যাজিক।"

ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরাম হতভম্ব। ম্যাজিশিয়ান জয়দীপ হেসে বলল, "এটাও বুঝতে পারলে না? আমি ছাদ থেকে দেখতে পেয়েছিলাম তুমি দাদুর ঘরের দিকে আসছ।"

হো হো করে হেসে উঠে মুন্‌শীরামজি বললেন, "এখন বুঝলাম। এবার আমার ম্যাজিক দেখবে?"

"দেখাও।"

ম্যাজিক দেখতে বা দেখাতে জয়দীপের কখনো আপত্তি হয় না।

পকেট থেকে একখানা রুমাল বার করে একদিকের দু'টি কোণ দু'হাতে ধরে দেখিয়ে দিলেন মুন্‌শীরামজি। একটা সাদা রুমাল, যার চার ধারে কালো বর্ডার। দেখিয়ে বললেন, "এই রুমালটি উপহার পেলে তুমি খুশি হবে?"

জয়দীপ বলল, "মোটেও না। ওর চাইতে ভালো রুমাল আমার অনেক আছে। দেখবে?"

"দেখাবার দরকার নেই। তুমি যখন বলছ তখন নিশ্চয় আছে।" বলে রুমালটা ভাঁজ করে আবার পকেটেই রেখে দিলো ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরাম, আর সঙ্গে সঙ্গে বার করে আনলেন ইঞ্চি খানেক লম্বা একটা ছোট্ট নল, যার ভেতরের ফাঁকটা একটা টাকার গোলের সমান।

নলটির গায়ের ওপর বাঁ হাত মুঠো করে মুন্‌শীরামজি জয়দীপকে বললেন, "এই নলটার ভেতর দিয়ে দাদুকে দেখতে পাচ্ছ?"

জয়দীপ বলল, "পাচ্ছি।"

মুন্‌শীরাম বললেন, "দূর-বীণ দিয়ে দেখছ মনে হচ্ছে না?"

জয়দীপ বলল, "মোটেও না। কাহু-বীণ দিয়ে কাছের দাদুকে দেখছি।"

মুন্‌শীরামজি বললেন, "বুঝতে পারছ তো যে নলের ভেতরটা একেবারে ফাঁকা, কিচ্ছু নেই?"

জয়দীপ বলল, "ভেতরটা ফাঁকা হতে যাবে কেন? হাওয়ায় ভরা।"

জয়দীপের কাছে আবার হেরে গিয়ে মুন্‌শীরামজি বললেন, "তা বটে। এই নলের ভেতর কোনোরকম রঙ লাগানো আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখ তো।"

খুব ভালো করে পরীক্ষা করল ক্ষুদে ম্যাজিশিয়ান জয়দীপ, পরীক্ষা করলাম আমি। দেখা গেল নলের ভেতরে বা বাইরে কোথাও কোনো রকম রঙ লাগানো নেই।

নলটা নিয়ে আগেকার মতোই সেটাকে মুঠো করে বাঁ হাতে ধরলেন ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরাম, তার পর ডান হাতে পকেট থেকে সেই চারধারে কালো বর্ডারওয়ালা সাদা রুমালখানা বার করে এনে বাঁ হাতের ওপর এমন ভাবে ছড়িয়ে দিলেন যেন রুমালের মাঝখানটা পড়ে নলের মুখের ওপর। ডান হাতের আঙুল দিয়ে রুমালের মাঝখানটা নলের মধ্যে দিয়ে তলার দিকে অনেকখানি ঠেলে দিয়ে তার পর নলের তলার দিকে ঠেলে-দেওয়া রুমালের মাঝখানটা রুমালের তলায় ডান হাত দিয়ে ধরে জয়দীপকে বললেন, "জয়দীপ, তোমার নিশ্চয় লাল রঙ খুব ভালো লাগে? বেশ, দেখ, রুমালটাকে লালই বানিয়ে দিচ্ছি। এক, দুই, তিন।"

রুমালের সবটা নলের মধ্যে দিয়ে নীচের দিকে টেনে নিয়েই অবাক্ কাণ্ড দেখিয়ে দিলেন ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরাম। কি আশ্চর্য! একটা টুক্‌টুকে লাল রুমালের মাঝখানটা ধরে দোলাচ্ছেন তিনি। বাঁ হাতে নলটা দেখালেন সম্পূর্ণ ফাঁকা।

দেখে আমি অবাক্। আর দেখলাম জয়দীপও ভেবে পাচ্ছে না কি করে নলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেই সাদা রুমালটার রঙ লাল হয়ে গেল।

সে বলল, "আবার রঙ বদলাতে পার?"

মুন্‌শীরাম বললেন, "পারতেই হবে। রুমালটা বলছে—শুনতে পাচ্ছ না?—কেন আমায় লাল বানালে? ফের আমায় সাদা বানিয়ে দাও।"

লাল রুমালটা নলের ভেতর দিয়ে টেনে নিতেই রুমালটা আবার সাদা হয়ে গেল।

দেখে আমি অবাক্।

মুন্‌শীরামজি সাদা রুমালটি আবার পকেটের আড়ালে চালান করে দেবার উপক্রম করছেন, এমন সময় হঠাৎ চিলের মতন ছোঁ মেরে রুমালটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল জয়দীপ। ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরাম ধারণাই করতে পারেন নি জয়দীপ এমন করে বিদ্যুদ্বেগে রুমালটা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে।

জয়দীপ বাহবুরি নেবার ভঙ্গীতে বলে উঠল, "কেমন জব্দ? কেমন জব্দ? ধরে ফেলেছি তোমার ম্যাজিক। এই দেখ দাদু, এটা দু'মুখো রুমাল—একদিক্ সাদা, আরেক দিক্ লাল।"

"এই খেলাটা তোমাকে শেখাব বলেই এসেছিলাম, জয়দীপ!" বললেন ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরাম। "কিন্তু আমি শেখাবার আগেই তুমি শিখে ফেললে জয়দীপ বাহাদুর! তোমাকে এখন থেকে জয়দীপ বাহাদুর বলেই ডাকব।"

"আমার নাম জয়দীপ চৌধুরী।" বলল জয়দীপ।

ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরাম বললেন, "আমার কাছে তুমি জয়দীপ বাহাদুর। খেলার কায়দাটা বুঝে গেছ তুমি। এই দু'মুখো রুমালটার সাদা দিক্‌টা দিয়ে নলটাকে ঢেকে দিলে মনে হবে একটা সাদা রুমাল দিয়ে নলটা ঢেকে দিয়েছ। রুমালের লাল দিক্‌টা নীচে আছে বলে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তার পর রুমালের মাঝখানটা নলের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তলার দিকে রুমালের লাল দিকের মাঝখানটা ধরে টেনে নিলেই রুমালের লাল দিক্‌টা বেরিয়ে পড়বে, সাদা দিক্‌টা লুকিয়ে পড়বে তার তলায়। দেখে সবাই ভাববে নলের মধ্যে দিয়ে টেনে নিতে সাদা রুমালটা ম্যাজিকের কায়দায় লাল হয়ে গেল।"

আমি বললাম, "কিন্তু প্রথমে যে দেখিয়েছিলেন রুমালটা দু'দিকেই সাদা?"

মুন্‌শীরামজি বললেন, "সেটা আরেকটা রুমাল। এই যে।" বলে পকেট থেকে আরেকটা রুমাল বার করে দেখালেন, সেটির দু'দিক্‌ই সাদা, শুধু ডবল রুমালটির মতোই তারও চারদিকে কালো বর্ডার।

"প্রথমে এই রুমালটা দু'দিকে সাদা দেখিয়ে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম।" বললেন ম্যাজিশিয়ান। "তার পর যখন সাদা-লাল ডবল রুমালটা পকেট থেকে বার করেছিলাম সাদা দিক্‌টা ওপরে রেখে, তখন আপনারা ভেবেছিলেন আমি আগের রুমালটাই বার করেছি, যার দু'পিঠই সাদা। রুমাল-বদল সন্দেহ করেন নি।"

কায়দা-করা দু'মুখো রুমালটা জয়দীপকে উপহার দিয়ে মুন্‌শীরামজি বললেন, 'তোমার অনেক রুমাল থাকতে পারে, কিন্তু এ রকম রুমাল একটিও নেই। সেই সঙ্গে এই নলটা, আর এই কায়দা-না-করা দু'পিঠ-সাদা রুমালটিও দিলুম। ম্যাজিকের এই খেলাটা দেখাবার সময় তোমার কাজে লাগবে। কিন্তু খবরদার, আগে খুব ভালো ভাবে অভ্যাস করে দাদুকে আর আমাকে দেখিয়ে নেবে। তার পর আমরা যখন বলব ঠিক হয়েছে, তখন অন্যকে দেখাবে। তার আগে নয়।"

জয়দীপ একটু চিন্তা করে নিয়ে তার পর বলল, "বেশ, তাই হবে। কিন্তু দাদুকে তো এখানেই পা:, তোমাকে পাব কোথায়?"

"এখানেই পাবে। এখানেই আমি অনেকবার আসব তোমাকে দেখতে, আর তোমাকে ম্যাজিক দেখাতে। তুমি যে আমাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছ, ম্যাজিশিয়ান জয়দীপ বাহাদুর!"

আমি বললাম, "কিন্তু আপনি ওকে যে ম্যাজিকের নেশা ধরিয়ে দিলেন মুন্‌শীরাজি, এর ফলে ওর পড়াশুনোর কি বারোটা বাজবে না?"

মুন্‌শীরামজি বললেন, "মোটেই না। বরং ম্যাজিকে মাথা বেশি খুল্‌বে, বুদ্ধি পাকা হবে, লেখাপড়া বেশি ভালো হবে। আমি তো ম্যাজিকে ডুবে ছিলাম, ডুবে আছি। কিন্তু ক্লাসে ফার্স্ট বয় ছিলাম বরাবর।"

চা আর জলযোগের পর বিদায় নেবার আগে মুন্‌সীরামজি খুব গম্ভীর মুখ করে জয়দীপকে বললেন, "দু'দিক্‌ সাদা যে রুমালটি তোমাকে দিয়ে গেলাম, জয়দীপ বাহাদুর, সেটা কিন্তু সাধারণ রুমাল নয়।— বশীকরণ রুমাল। ঐ রুমালটাকে ডান হাতে ধরে যার চোখের সামনে তিনবার দোলাবে, সে সঙ্গে সঙ্গে তোমার এমন বশ হয়ে যাবে যে তুমি তাকে যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে, আর যা করতে হুকুম করবে তাই করবে।"

জয়দীপ বলল, "যাঃ, বাজে কথা। তা কি কখনো হতে পারে?"

"নিশ্চয় হতে পারে। তোমাকে আমি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেব।" বললেন ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরাম।

"কবে?" জয়দীপের প্রশ্ন।

"বল এখ্‌খুনি। যদি দাদুকে নিয়ে আমার সঙ্গে আমার গাড়িতে একটু বেরোতে পার।"

জয়দীপ সোৎসাহে রাজী। আমিও রাজী হয়ে গেলাম।

ছুটির দিন। বিশেষ কোনো কাজ হাতে ছিল না। ম্যাজিশিয়ান মুন্‌শীরামের সঙ্গে তাঁর গাড়িতে চড়ে রওনা হলাম কোথায় গিয়ে তিনি বশীকরণ রুমালের কেরামতি দেখাবেন, তাই দেখতে।

ভূতের পাল্লায় পিসেমশায়

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী পড়ছিল ওরা। ভূতের নাম শুনে গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজ যখন ভয়ে দৌড় দিল, তখন বুলান, ডিংকু, তুলু হেসে গড়াগড়ি।

হাসছিস যে তোরা? বলল বাপ্পা।

গজপতির কাণ্ড দেখে ভূত আবার আছে নাকি? জিজ্ঞাসা করে ডিংকু।

ভূত নেই? বলিস কি?—তা হ'লে ও নামটা এল কোত্থেকে? নাম থাকলেই বস্তু থাকবে। উত্তর দেয় বাপ্পা।

ঘোড়ার ডিমও তো একটা নাম। তাই বলে 'ঘোড়ার ডিম' বলে কোনও বস্তু আছে নাকি? উত্তর দেয় ডিংকু।

বাপ্পা বলে, না, ওটা নাম নয়। ওটা একটা কথা, প্রবাদ বাক্য। ওটা কোন বস্তু নয়। ওর মানে হচ্ছে কিছুই না। আমি যদি বলি, 'তুই পাবি ঘোড়ার ডিম'—তার মানে তুই কিছুই পাবি নে।

ডিংকু তারপর আরও জোর দিয়ে বলল,—ভূত ভূত কচ্ছিস্, ভূত দেখেছে কেউ? সবাই তো যা বলে তা তাদের শোনা কথা। নিজে কেউ দেখেছে ভূত?

পিসেমশায় যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে। থমকে দাঁড়ালেন কথাটা শুনে। বললেন, কি বললি? ভূত শোনা কথা? ভূত দেখে নি কেউ? তারপর তাঁর বুড়ো আঙ্গুলটা বুকে ঠেকিয়ে বললেন, এই আমি, বিশ্বনাথ চাটুয্যে স্বয়ং স্বচক্ষে দেখেছি ভূত। পড়িস্ নি তো ওদের পাল্লায়, তা হ'লে বুঝতিস ঠেলাটা।

ডিংকু বিজ্ঞের মতো ঘাড় তুলে বলে, ভূত থাকেই যদি তা হ'লে তাদের দেখতে পাই নে কেন ?

বাতাস দেখতে পাস্ ? তাই ব'লে কি বাতাস নেই নাকি ? জিজ্ঞাসা করেন পিসেমশাই।

মিঠুন বলে,—গাছের পাতা নড়লে বুঝতে পারি বাতাস আছে, কিন্তু ভূত ?

ভূতও তেমনি ঘাড় মটকে কি গাছের ডাল ভেঙ্গে চলে গেলে বুঝতে পারা যায় ভূত আছে।—উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেন পিসেমশায়। 'ভূত কি যেখানে সেখানে থাকে যে দেখবি ? ভূত থাকে বাঁশঝাড়ে, শেওড়া গাছে, শ্মশানে, নির্জন ফাঁকা মাঠে। শহরেও ঘুরে বেড়ায় ভূত। তবে ছদ্মবেশে। চিনবার উপায় নেই। অপমৃত্যু হ'লেই সে ভূত হবে। এই ভাবে ভূত, পেত্নী, বেহ্মদত্যি, শাঁখচুন্নী, সাহেব ভূত, কাবলী ভূত এবং আরও রকমারি ভূত।

ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি হচ্ছিল, তার উপর লোড শেডিং। ওরা সবাই মিলে পিসে-মশায়কে চেপে ধরল,—আপনার ভূতের পাল্লায় পড়ার গল্পটা বলতেই হবে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পিসেমশায় বসলেন। বললেন, গল্প নয় রে—এটা সত্যি ঘটনা। মনে করলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তবে শোন্ ঃ

আমার তখন যোয়ান বয়েস। ভূত-ফুত মানি নে। পাড়াগাঁয়ে থাকি। এক বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। একটা আড্ডাও বসেছিল সেখানে। উঠল ভূতের গল্প। এ গল্প একবার উঠলে আর থামতে চায় না। মুখে মুখে ফেরে। রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেল। পাড়াগাঁয়ে রাত এগারোটা মানে নিশুতি রাত। বাড়ি ফিরতে হবে বাঁশঝাড়, শেওড়া বন আর শ্মশানের কাছে মেঠো পথ দিয়ে। সঙ্গী পেলাম না কাউকে। সঙ্গী না পেলেও আমি পরোয়া করি নে।

গরমকাল। বেলে বেলে জ্যোৎস্না। বেরোবার সময় ওদের বেড়ার হুড়কো থেকে ছোট একটা বাঁশ নিলাম কাঁধে তুলে। শুনেছিলাম, মাঝে মাঝে নাকি ওনারা শিয়াল-কুকুরের রূপ ধরেও পিছু নেন, তাই এই সতর্কতা।

ঝোপ-জঙ্গল পেরিয়ে পায়ে-চলা মেঠো পথে পড়লাম। কাছেই শ্মশান। বেলে বেলে জ্যোৎস্নায় সাদা পথটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম ; হঠাৎ দেখি, বেশ খানিকটা দূরেই সাদা কাপড় পরে ঘোমটা দিয়ে কে যেন চলে যাচ্ছে। আমি হাঁক দিয়ে বললাম, কে ? উত্তর নেই। সে চলেই যাচ্ছে। আমিও ওকে ধরব ব'লে ওর ওপর নজর রেখে জোরে পা চালালাম। কিন্তু যে দূরত্বে ছিল সেই দূরত্বেই থেকে গেল সে !

গাঁয়ের কেউ পালিয়ে যাচ্ছে মনে করে আমি আরও জোরে পা চালালাম। কিন্তু ও একই দূরত্বে থেকে হাঁটছে তো হাঁটছেই। আমি গলদ্ঘর্ম হয়ে গেলাম। গলাটা কেমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। চিৎকার করে বলতে যাচ্ছিলাম, কে যায়? কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। তবে কি ওটা মানুষ নয়—পেত্নী?

বাপ্পা, মিঠুন, তুলিকা, ডিংকু ওরা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, এবার ওরা চোখ বড় বড় ক'রে এগিয়ে এল এ-ওর কাছে।

পিসেমশায় বললেন, পাশেই একটা বাঁশঝাঁড়। তার ছায়া এসে পড়েছে পথের উপর। পেত্নীটা সেই ছায়ায় মিলিয়ে গিয়ে বোধ হয় বাঁশগাছে গিয়ে উঠল। এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা বাঁশ পথের ওপর নীচু হ'য়ে পড়েছে। এই বাঁশ দিয়েই সে উঠেছে নিশ্চয়। হাতের সেই হুড়কোর বাঁশ দিয়ে মারলাম সেই বাঁশটায় এক ঘা। বাঁশটা খানিকটা ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঝির ঝির ক'রে জলের মত কি পড়ল আমার সারা গায়ে। রাম বল।

বাপ্পা, মিঠুন, বুলান ওরা তখন এ-ওকে জড়িয়ে ধরেছে ভয়ে।

পিসেমশায় বললেন, আমি ভয়ে চমকে গেলাম। দিলাম ছুট। পিছনে তাকিয়ে দেখি, বাঁশঝাড় থেকে কে যেন একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমার দিকে।

ছুটতে ছুটতে গয়লাপাড়ার কাছে এসে লোকজন ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে কথা বেরুল না।

বাড়ি এলে আমার হতভম্ব ভাব দেখে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। একজন রোজাকে ডেকে আনা হ'ল তখনই। রোজা সব শুনে বলল, ওটা একটা মেছুনী। অনেক দিন থেকে ঐ রাস্তায় আছে ওই পেত্নীটা। শনি-মঙ্গলবারে হাটুরেদের বড় জ্বালাতন করে। একা পেলে, শুনেছি, তার মাছ কেড়ে খায়। সুবিধা করতে না পারলে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে রান্নাঘরে মাছ রান্নার সময় জানালা দিয়ে হাত বাড়ায়।

ডিংকু ভূত নেই বলেছিল, সেও এবার জড়িয়ে ধরল বাপ্পাকে।

পিসেমশায় বললেন, রোজার কথা মত আমাকে খালুই ধোওয়া জল দিয়ে স্নান করানো হ'ল। দশ বালতি কূয়োর জল ঢালা হ'ল আমার মাথায়।

সেই রাত্রেই আমার কাঁপিয়ে জ্বর এল। সাত-আট দিন বিছানায় পড়ে থেকে, কত ঝাড়-ফুঁক করে কিছুই হ'ল না। শেষটায় তারিণী ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে তবে সেরে উঠলাম।

এর পরেও বলবি ভূত নেই? আমি কি তবে বানিয়ে বলছি? বলে পিসেমশায় গম্ভীর হয়ে গেলেন।

[লেখকের নিবেদন : আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক কল্পকথার মতো এটাও একটা বিজ্ঞানভিত্তিক ভূতের কথা। বড়দের কেউ ছোটদের কাছে এই ভূত দেখার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করে দিলে ভালো হয়।—নঃ চঃ]

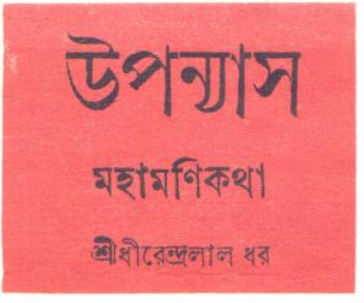

— আটাশ —

ত্রিরাত্রি জপ করার শেষে হোম করে তন্ত্রিকাচার্য শিবনাগকে উপবীত দিলেন, বললেন, উষাকালে ও গোধূলি লগ্নে নিয়মিত গায়ত্রী জপবে, তাতে শক্তিলাভ করবে। এবং, যখন যেটুকু অবকাশ পাবে, শিব-নাম জপ করবে, তাতে ব্যক্তিত্ব অদম্য হয়ে উঠবে। তোমাকে বিশেষ মানুষ হয়ে উঠতে হবে। হিন্দুর পুনরুত্থানের তুমিই হবে প্রধান অবলম্বন। আমি তোমাকে সেই পথেই পরিচালিত করবো।

কয়েকটি দিন শিবনাগের সেইখানেই কাটলো। তার পর শিবনাগ আচার্যের কাছ থেকে বিদায় চাইল। তন্ত্রাচার্য বললেন,—সামনের অমাবস্যা কেটে যাক, তার পর যেখানে ইচ্ছা যেও।

তার মথুরা যাবার সঙ্গে অমাবস্যার কি সম্পর্ক তা শিবনাগ বুঝতে পারলো না, কিন্তু তন্ত্রাচার্যের মুখের পানে তাকিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও তার সাহস হ'লো না।

দিন এগিয়ে চললো।

অমাবস্যা এসে পড়লো।

কুটীরের সামনে আগুন জেলে সারাদিন তন্ত্রাচার্য হোম করলেন। সূর্যাস্তে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে সেই হোমের সমস্ত ভস্ম সারা দেহে মাখলেন, তার পর বললেন,—আমি বেরুচ্ছি, রাত্রিশেষে ফিরবো, তুমি সারারাত ওই যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়ে রাখবে এবং মহেশ্বরের নাম জপ করবে। আজকের রাত্রে তোমার ঘুমানো চলবে না।

তন্ত্রাচার্য কি উদ্দেশ্যে কি করেন তা শিবনাগ বোঝে না, তবে মানুষটির সিদ্ধাই শক্তিকে সে ভয় করে। এখন মনে হয় এই মানুষটির কাছে বিদায় নিতে আসাটা বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হয় নি। যাই হোক্, এখনকার পরিস্থিতিকে না মেনে উপায় নেই। শিবনাগ হোমাগ্নির সামনে এসে বসলো।

তন্ত্রাচার্য নদীর তীর ধরে নগরের দিকে চলে গেলেন। অন্ধকারে তাঁকে আর দেখা গেল না।

রাত দুপুর। অমাবস্যার রাত। সূচীভেদ্য অন্ধকার। সিন্ধুনদের তীর ধরে যে পথটি চলে গেছে সেই পথ ধরে একজন লোক অতি ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে চলছিল। মনে হয় সে ছুটছিল, কিন্তু চলছিল সে রণপায়ে। দু'টি বাঁশের লাঠির প্রায় দু'-হাত উপরে পা রেখে সে চলছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে চলার চেয়ে সে গতি কম নয়। দিনের আলোয় এ ভাবে পথ চলতে মানুষ সঙ্কোচ বোধ করে, কিন্তু এই রাত্রির অন্ধকারে সে সঙ্কোচ আর নেই। তা ছাড়া সঙ্কোচ কিসের,—যে ক্ষেত্রে মানুষকে দেখাই যায় না?

পুরুষপুর বাঁ পাশে রেখে পথচারী কণিষ্কস্তূপের তোরণে এসে থামলো।

তোরণে কোন দ্বার ছিল না। কোন রক্ষীও ছিল না। পথচারী রণপা থেকে নেমে, রণপা তোরণের পাশের দেয়ালের গায়ে রেখে, ভিতরে স্তূপ প্রদক্ষিণের পথ ধরলো।

বিশাল স্তূপকে ঘিরে প্রদক্ষিণ-পথ চক্রাকারে উপরে উঠে গেছে, স্তূপশীর্ষের ত্রিচক্র অবধি চলে গেছে। পথচারী বরাবর সেই ত্রিচক্রে এসে থামলো।

এবার দেখা গেল পথচারী রিক্ত হস্তে আসে নি, তার হাতে বিশেষ ধরণের পেঁচালো এক দীর্ঘ লৌহশলাকা।

স্তূপশীর্ষে ত্রিচক্র স্থাপিত। তার একটু নীচে প্রদক্ষিণ-পথের শেষে পথচারী বসে পড়লো। পাশের দেয়ালে একখানি বড় পাথর লাগানো ছিল, হাত বুলিয়ে অন্ধকারে সেটা উপলব্ধি করলো। তার পর হাতের লৌহশলাকাটি দিয়ে পাথরখানির চারিপাশ আলগা করতে শুরু করলো।

পাথরখানি সম্ভবতঃ আলগা করেই বসানো ছিল, তা হ'লেও বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর পাথরখানির দু'দিকে দু'টি খাঁজ বেরুল। সেই খাঁজে লৌহশলাকার চাপ দিয়ে পথচারী পাথরখানি টেনে বের করে আনলো। তার পর ভিতর দিকে ঝুঁকে পড়ে একটি স্বর্ণপাত্র বার করলো। পাত্রের ঢাকনা খুলতেই তার মধ্যে মহামণিটি ঝলমল করে উঠলো। পথচারী মণিটি নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালো। মণির জ্যোতিতে এবার পথচারীকে চেনা গেল, তিনি সিন্ধুতীরের তন্ত্রাচার্য।

তন্ত্রাচার্য মণিটি উত্তরীয়ে জড়িয়ে কোমরে বাঁধলেন, তার পর স্বর্ণপাত্রটি যথাস্থানে রেখে, পাথরখানি ঠিকমত সন্নিবিষ্ট করে প্রদক্ষিণ-পথ দিয়ে নেমে এলেন। নীচে তোরণের পাশে রণপা ছিল, রণপায়ে উঠে প্রস্থান করলেন।

ঊষালোকে তন্ত্রাচার্য এলেন নগরের প্রান্তে ভাস্করপল্লীতে। এখানে শুধু পাথর খোদাইকারই নয়, ধাতুমূর্তি ও মাটির মূর্তি গড়ার কারিগররাও বাস করে। একপাশের একটি গৃহদ্বারে এসে আচার্য ডাকলেন,—দেবদাস, দেবদাস!

সদ্য ঘুমভাঙা এক প্রবীণ এসে দাঁড়ালো, বললো,- প্রণাম হই আচার্য!

—আমার মূর্তি প্রস্তুত হয়েছে?

—রাতেই কাজ শেষ করে রেখেছি।—বলে প্রবীণ ভিতরে চলে গেল। ভিতর থেকে একটি ছোট তামার মূর্তি এনে আচার্যের হাতে দিল। এক বিঘৎ পরিমাণ ছোট একটি নটরাজ মূর্তি। আচার্য মূর্তিটি আলোয় ধরে নিরীক্ষণ করে দেখলেন। মূর্তিটির পৃষ্ঠদেশে একটু চাপ দিলেন, একটা ঢাক্না খুলে এলো। মূর্তির ভিতরটা ফাঁপা, কৌটোর মতো। ঢাক্নাটা আবার লাগিয়ে দিয়ে আচার্য

বললেন,—ঠিকই হয়েছে, যেমন বলেছিলাম তেমনই করেছো। আজ সন্ধ্যায় যেও, তোমাকে যোগ্য পারিশ্রমিক দিয়ে দেবো।

আচার্য মূর্তি নিয়ে চলে এলেন। কিছুটা এসে নদীতে নেমে মূর্তিটি মার্জনা করে নিয়ে উত্তরীয় থেকে মণিটি খুলে নিয়ে তার মধ্যে রাখলেন। এবার মূর্তিটি উত্তরীয়ে জড়িয়ে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে রণপায়ে উঠে আশ্রমে ফিরলেন। তখন পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের গোলাপী আলো ফুটছে। স্নান শেষ করে নদীর জলে দাঁড়িয়ে শিবনাগ গায়ত্রী জপছে।

কুটীর-মধ্যে দেবপূজার বেদী ছিল। তার উপর নটরাজ মূর্তিটি স্থাপিত করে তান্ত্রিক মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন,—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, হে নটরাজ!

এবার তান্ত্রিক উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন,—শিবনাগ!

শিবনাগ নদীতীর থেকে উঠে এলো।—আমায় ডাকছেন আচার্য?

আচার্য বললেন,—তোমার জন্য এই শিবমূর্তি নিয়ে এলাম। এই শিবমূর্তি মাথায় করে তুমি মথুরায় নিয়ে যাবে। সকাল ও সন্ধ্যায় যথারীতি এই দেবতার পূজা করবে। দিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন আহার করবে। বারো বছর পার হলে, শিবরাত্রির রাত্রে আমি তোমার সঙ্গে মথুরায় দেখা করবো, তখন তুমি দৈবশক্তি লাভ করেছো। তোমার বংশ বহু পুরুষ ধরে শৈব। শিব-আরাধনার মাধ্যমে শক্তি পাওয়াই তোমার পক্ষে সহজ। একবার শক্তিলাভ ঘটলে দেবদেবীর পূজা-অর্চনা সমারোহে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হবে না।

—আমার মতো সাধারণ একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে—

—তখন তুমি আর সাধারণ থাকবে না।—আচার্য বাধা দিয়ে বললেন,—সেদিন তুমি হবে অসাধারণ—পণ্ডিত, স্থিতধী, বিত্তবান্ ব্রাহ্মণ।

শিবনাগ চুপ করে তন্দ্রাচার্যের পানে তাকিয়ে রইলো।

পরদিন সকালে পূজা-অর্চনা শেষে নটরাজ-মূর্তিটি তন্ত্রাচার্য শিবনাগের হাতে তুলে দিলেন, বললেন,—এখনই শুভক্ষণ, যাত্রা শুরু করো।

কাঁধের ঝোলার মধ্যে নটরাজ-মূর্তিটি রেখে শিবনাগ তন্ত্রাচার্যকে প্রণাম করার উদ্যোগ করতেই তন্ত্রাচার্য বাধা দিলেন, বললেন,—দেববিগ্রহ সঙ্গে নিয়ে কাউকে প্রণাম করা চলে না। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তুমি যাত্রা করো। বারো বছর পূর্ণ হবার পর শিবরাত্রির দিন আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। কল্যাণমস্তু—

শিবনাগ কুটীর থেকে পথে নামলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে স্তূপশীর্ষের পাথরখানি মহাস্থবির নাগার্জুনের নজরে পড়লো। সন্দেহ হ'লো। তিনি সম্রাট্‌কে জানালেন। সম্রাট্ এক রাত্রে সাধারণ নাগরিক-বেশে একজন মাত্র অনুচর নিয়ে নাগার্জুনের সঙ্গে স্তূপশীর্ষে এলেন। অনুচরের সহায়তায় পাথরখানি স্থানচ্যুত করে ভিতরের প্রকোষ্ঠ থেকে স্বর্ণপাত্র বের করলেন। পাত্রের মধ্যে মহামণি নেই। সম্রাট্ চম্‌কে উঠলেন। এই গোপন প্রকোষ্ঠ তো সাধারণের কাছে গুপ্ত ছিল। মণিটি তা হ'লে কে নিল?

সমগ্র পুরুষপুরে রাজকীয় গুপ্তচররা অতি তৎপর হয়ে উঠলো। প্রতি গৃহ ও প্রতিটি নাগরিকের উপর তারা দৃষ্টি রাখলো। মাসাধিক কাল পার হয়ে গেল, মহামণির সন্ধান মিললো না। সম্রাট্ বিমর্ষ হলেন। একটা কথা তাঁর মনে হ'লো—দেবভোগ্য মণি কি তবে নিয়মিত পূজা না পাওয়ায় অন্তর্হিত হলো? তবে কি তিনি অপরাধী? সম্রাট্ মনে শান্তি পান না।

— উনত্রিশ —

দেখতে দেখতে বারোটি বছর কেটে গেল।

দিনে একবার স্বপাক অন্নগ্রহণ ও অষ্টপ্রহর শিবনাম জপ ও শিবপূজা শিবনাগকে ভিন্ন ধরনের মানুষ করে তুললো।

সংসারে মা ছিলেন, অন্যান্য ভাই ছিল, কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে শিবনাগের কোন যোগ ছিল না। বহু বছর গৃহ ত্যাগ করে সে বিহারের বাসিন্দা হয়েছিলো। তখন থেকেই তো বাড়ির সঙ্গে যোগ ছিল না। এখন ফিরে এসে নতুন করে সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় নি। আগের মতই সে বাইরের মানুষের মত রয়ে গেল। একবার শুধু স্বপাক রন্ধনের জন্য যেটুকু প্রয়োজন, বাকি সময় তো ঘরের মধ্যেই পূজা-অর্চনা। অবশ্য এজন্য ভাইদের কোন বিরূপ ভাব ছিল না, আর ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে —এতেই মা খুশি ছিলেন। পূজা-অর্চনার মধ্যে দিয়ে শান্তিতেই শিবনাগের দিন কাটছিলো।

বারো বছর শেষে, শিবরাত্রির রাতে চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ করে, প্রণাম করে ভূমি থেকে মাথা তুলেই শিবনাগ দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তন্ত্রাচার্য।

শিবনাগ তাঁকেও প্রণাম করলো।

তন্ত্রাচার্য বললেন,—আজ তোমার ব্রত পূর্ণ হ'লো। বারো বছর সংযম ও সাধনার মধ্যে দিয়ে তুমি চরিত্র-বল অর্জন করলে; এবার তুমি অসাধ্য সাধন করবে। অন্যে যা পারে না তুমি তা পারবে। সাধারণ ব্যথা-বেদনা বা অসুস্থতা তুমি হাত বুলিয়ে মন্ত্র জপে নিরাময় করার শক্তি অর্জন করেছো। তুমি এখন মন্ত্রসিদ্ধ সিদ্ধাই-এর স্তরে উন্নীত হয়েছো।

শিবনাগ বললো,— অনেক সাধনা করে তো সিদ্ধাই হয় বলে জানি।

আচার্য বললেন,—তুমিও তো বারো বছর একাগ্র মনে জপ-তপ সাধনা করলে। এদিকে তুমি এবার যত অগ্রসর হবে, তোমার তত শক্তিলাভ হবে। তবে এবার আমি তোমাকে ভিন্ন কর্মে নিয়োগ করতে চাই। তুমি এবার এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করে নটরাজকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করো, আর সেই সঙ্গে এখানে একটি পুণ্যশালা করো, যেখানে নিরন্নরা এসে অন্নভোগ পাবে। এখানে দিনে দিনে পূর্বগৌরবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাই।

—এ সব তো যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। আমার অর্থ কোথায়?

—অর্থের অভাব হবে না, সে অর্থ তুমি পাবে। অর্থের সন্ধান আমি দেবো। (ক্রমশ)

—: ▪ :—

ধূমকেতু আসছে

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়েছে। এ রকম ঘটনা নাকি ভীষণ এক অমঙ্গলের চিহ্ন। কোনো মহামারী, কোনো বড় ধরনের যুদ্ধ বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিশ্চয়ই দেখা দেবে এবং শীগ্‌গিরই। প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর ভগবানের কাছে। এ বিপদ্ থেকে মানুষকে রক্ষা করুন তিনি।

মহাকাশের বাসিন্দাদের মধ্যে ধূমকেতুর অদ্ভুত চেহারাটাই হয়তো এ ধরনের অমঙ্গলের কথা মনে এনে দিয়েছিল সেকালকার লোকদের। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, যে যুগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল সে যুগেও ধূমকেতুর রহস্য জ্যোতির্বিদ্ বা অন্য বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যই থেকে গিয়েছিল। কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব না হলে সেটিকে ঘিরে তৈরি হয় নানা অবাস্তব কল্পনা। ধূমকেতুর আবির্ভাবের পেছনেও সম্ভবতঃ এমনি ধরনের অমঙ্গল-কল্পনা এসেছিল ঐ একই কারণে।

নিউটন আবিষ্কার করলেন তাঁর মহাকর্ষতত্ত্ব। ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ্ টাইকো ব্রাহে নিউটনের তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে সর্বপ্রথম ধূমকেতুদের রহস্যের সমাধান করেন। তিনি হিসেব করে বলেন, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে যে ধূমকেতুটি আকাশে দেখা দিয়েছিল সেটির দূরত্ব পৃথিবী থেকে চাঁদের যে দূরত্ব তার ছ'গুণ তো বটেই। তবে ধূমকেতু সম্বন্ধে সে যুগে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন বৃটিশ জ্যোতির্বিদ্ এডমণ্ড হ্যালি। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতুটি পৃথিবীর আকাশে দেখা দিয়েছিল তিনি সেটি দেখে নিউটনের তত্ত্বের সাহায্যে হিসেব-টিসেব করে বললেন যে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার এই ধূমকেতুটিই পৃথিবীর আকাশে দেখা দেবে। হ্যালির হিসেব ছিল নির্ভুল। নির্দিষ্ট বছরে ধূমকেতুটি সত্যিই আবার আকাশে দেখা দিল, কিন্তু হ্যালি সেটি দেখবার জন্যে তখন আর বেঁচে ছিলেন না। তিনি দেহত্যাগ করেন এর কয়েক বছর আগে, ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তবে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে গেলেন যে গ্রহ-উপগ্রহদের মতো ধূমকেতুরাও আমাদের সৌরজগতেরই বাসিন্দা। যে নিয়ম মেনে গ্রহ-উপগ্রহরা চলাফেরা করছে ধূমকেতুরাও সে নিয়ম মেনেই চলে বেড়াচ্ছে যুগযুগান্ত ধরে।

১৬৮২ বা ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে ধূমকেতুটি দেখা দিয়েছিল সেটির নামকরণ হ'ল হ্যালির নাম অনুসারে—হ্যালির ধূমকেতু। এ ধূমকেতুটি প্রতি ৭৬ বছর অন্তর

দেখা দেয় আমাদের পৃথিবীর আকাশে। সর্বশেষ এটি দেখা দিয়েছিল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। আমরা এই হ্যালির ধূমকেতুর কথাই বলছি। হিসেব মতো এর আবার আসার কথা ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগমনবার্তা ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে। মহাকাশের এক সুদূর অঞ্চলে একে খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। শনি গ্রহ যে পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে তা থেকেও অনেক দূরে ইনি বর্তমানে বিরাজিত। সেকেণ্ডে দশ কিলোমিটার বেগে এগিয়ে আসছেন পৃথিবীর দিকে। যত কাছে আসবে ততই তার গতিবেগ বেড়ে চলবে। ১৯৮৬ খৃঃ সে যখন একেবারে আমাদের কাছে এসে পড়বে

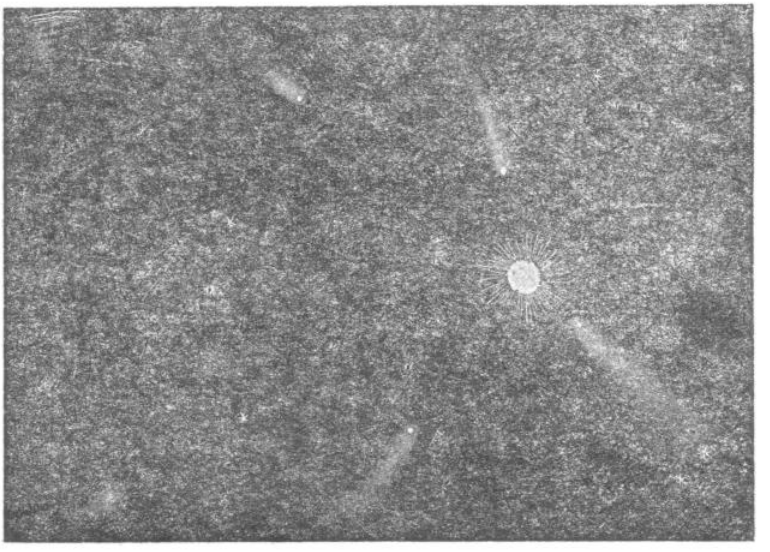

সূর্যকে ঘিরে ধূমকেতুর ভ্রমণ-পথ : সূর্যের কাছে এলে লেজটি হয়ে পড়ে বিরাট, তার পর যত দূরে চলে যায় ততই ছোট হতে থাকে।

তখন তার গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ৫৫ কিলোমিটার, আর তখনই আমরা সকলে তাকে খালি চোখে স্পষ্ট দেখতে পাব। সংবাদটা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর সব দেশেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে—বিশেষ করে বিজ্ঞানী-মহলে তো বটেই। সাধারণ লোকের উৎসাহটাও নিতান্ত কম নয়। কারণ এ সুযোগ একবার হারালে জীবনে দ্বিতীয়বার আর এ সুযোগ মিলবে না।

আগেই বলা হয়েছে যে হ্যালির ধূমকেতু প্রতি ৭৬ বছরে একবার করে

পৃথিবীর আকাশে দেখা দেয়। সে হিসেবে ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দেই এর আসবার কথা। কয়েক বছর আগে থেকেই এর অনুসন্ধানের কাজ চলল আকাশের আনাচে-কানাচে। গত বছর ১৬ই অক্টোবর এর সন্ধান পাওয়া গেল এক শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে। এ কাজে কৃতিত্ব অর্জন করলেন আমেরিকার সেই বিখ্যাত প্যালোমার অবজারভেটারি বা মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদ্‌রা। প্রথম যখন একে দেখা যায় তখন পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ১৬৫ কোটি কিলোমিটার।

এ ধূমকেতুটি যেদিন আমরা খালি চোখে দেখতে পাব সেদিন আর বেশি দূরে নেই। ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসেই একে খালি চোখে দেখা যাবে সর্বপ্রথম। তারপর ক্রমে এর উজ্জ্বলতা বাড়বে এবং বিরাট লেজটি দেখা দিতে শুরু করবে। আমাদের সবচেয়ে কাছে আসবে ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল, আর ওর দূরত্ব তখন পৃথিবী থেকে থাকবে ৬ কোটি কিলোমিটার। ঐ সময়ে ওর লেজটির দৈর্ঘ্য থাকবে প্রায় সাড়ে সাত কোটি কিলোমিটার। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই লেজটির দৈর্ঘ্য দেখা গিয়েছিল ১০ কোটি কিলোমিটার।

হ্যালির ধূমকেতু যে পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে তা হচ্ছে ডিম্বাকৃতি, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় উপবৃত্তাকার। এ পথটা একবার ঘুরে আসতে তার সময় লাগে সঠিক ভাবে ৭৬·১ বছর। আপন অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরতে হ্যালির ধূমকেতু সময় নেয় ১০·৩ ঘণ্টা। হ্যালির ধূমকেতুর ওজন প্রায় ১৯শ কোটি টন। এবারে অবশ্য ওর ওজন আরও কিছুটা কম হওয়াই সম্ভব, কারণ সূর্যের কাছাকাছি এলে ধূমকেতুর খানিকটা পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। লিখিত বিবরণে পাওয়া যায়, হ্যালির ধূমকেতু প্রথম দেখা গিয়েছিল যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ২৪০ বছর আগে। তার মানে সে ইতিমধ্যে ২৮বার পৃথিবীর আকাশে দেখা দিয়ে গেছে।

হ্যালির ধূমকেতুই কিন্তু আকাশে একমাত্র ধূমকেতু নয়। বিজ্ঞানীরা বলেন, গড়ে প্রতি বছরে পাঁচটি করে ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে পৃথিবীর আকাশে। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের আকাশে ১৪টি ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল। এর আবার ১০টিই নবাগত। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৭০০র মতো ধূমকেতু দেখা গিয়েছে, অবশ্য দূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে। এর মধ্যে মাত্র ৬০টির মতো ধূমকেতু বারে বারে এসে হাজির হয়েছে আমাদের আকাশে। অধিকাংশই একবার মাত্র দেখা দিয়েই চিরতরে মিলিয়ে গিয়েছে মহাকাশে। হয়তো এদের মধ্যে কেউ কেউ পাঁচ-সাতশ' বছর পরে আবার এসে হাজির হতেও পারে পৃথিবীর আকাশে।

ধূমকেতুর দেহে তিনটি অংশ।—এক নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন,—এ অংশটি হ'ল তারার মত উজ্জ্বল। এর চারদিকে ঝাঁকড়া চুলের মত যে অংশটি তার নাম কোমা। ওর তৃতীয় অংশটি হ'ল তার দীর্ঘ পুচ্ছ বা লেজটি। ধূমকেতুর ইংরেজি নাম 'কোমেট'। কথাটি এসেছে 'কোমা' (বা ঝাঁকড়া চুল) শব্দটি থেকে। নিউক্লিয়াস খুব বড় হয় না—১ থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যেই এর আকার। ১৯১০ খৃঃ যে হ্যালির ধূমকেতুটির দেখা মিলেছিল তার নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্দ্ধ ছিল মাত্র ১৫ কিলোমিটার। কোমার আকার অনেক—অনেক বড়; দশ হাজার থেকে এক লক্ষ কিলোমিটার ব্যাসার্দ্ধ হতে পারে। ধূমকেতুর সবচেয়ে বড় অংশটি হ'ল তার

উঁচু পাহাড়ের ওপর অবজারভেটারি। এখান থেকেই ধূমকেতুর গতিবিধি ধরা পড়েছে।

লেজটি। লেজটি অবশ্য সব সময় থাকে না—সূর্যের কাছে এলেই লেজটি গঠিত হয়। সূর্যের বিকিরণের চাপে ওর দেহের কিছুটা পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে তার দীর্ঘ লেজটি গঠন করে। এই বাষ্পীভূত পদার্থকণিকার ওপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয় বলে লেজটি দেখা যায় সব সময় সূর্যের বিপরীত দিকে। লেজের মধ্যে পদার্থের পরিমাণ থাকে খুবই সামান্য। এর ফলে আমাদের পৃথিবী ধূমকেতুর লেজের ভেতর দিয়ে চলে গেলেও কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। প্রকৃত পক্ষে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতুর লেজের ভেতর দিয়ে আমাদের পৃথিবী চলেও গিয়েছিল, কিন্তু তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয় নি। কোনো ধূমকেতু এসে যদি পৃথিবীকে

সরাসরি আঘাত করে তবে আমাদের কোনো ক্ষতি হতে পারে কি? বিজ্ঞানীরা বলেন, না, তার সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। কারণ সবচেয়ে ভারী এবং বড় যে ধূমকেতুর সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তার ওজন পৃথিবীর ওজনের একলক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, ধূমকেতুরা সবাই আমাদের সৌরজগতেরই বাসিন্দা। এখানকার অন্যান্য বাসিন্দাদের মতো এরাও একই নিয়ম মেনে চলে। পৃথিবী নামে যে গ্রহটির ওপরে আমরা বসবাস করছি সূর্যের চারদিকে তার পরিভ্রমণ-কাল এক বছর, আর হ্যালির ধূমকেতুর বেলা তা ৭৬ বছর—এই যা তফাৎ। তবে ধূমকেতুর সৃষ্টি কি ভাবে—এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত ন'ন। কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে যে গ্রহাণুপুঞ্জ বর্তমান তেমনি কোনো গ্রহাণুপুঞ্জ থেকেই ওদের সৃষ্টি। এই গ্রহাণুপুঞ্জের অবস্থান প্লুটো যে পথে সূর্যের চারদিকে ঘোরে সে পথেরও বাইরে। এ অঞ্চলে একটি গ্রহ তৈরি হতে গিয়েও কোনো কারণে তা হতে পরে নি। তারপর টুকরোগুলো নানা ঘাত-প্রতিঘাত, নানা পরিবর্তনের পরে একাধিক ধূমকেতুতে পরিণত হয়েছে। সূর্য থেকে বহু দূরে থাকার জন্যে এগুলো সেখানে ঘনীভূত আকারেই রয়ে গেছে। যখন এরা সূর্যের কাছে এসে হাজির হয় তখন এদের দেহের কিছু কিছু পদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে লেজের আকার পেয়ে থাকে। বর্তমান কালে অধিকাংশ বিজ্ঞানীর ধারণা—যে মহাজাগতিক মেঘ বা ধুলোরাশি থেকে আমাদের সৌরজগৎ সৃষ্টি হয়েছে সেই একই মেঘ বা ধুলোরাশি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ধূমকেতু। ধূমকেতুর দেহের মধ্যে হাইড্রোজেন, কার্বন, গন্ধক, সোডিয়াম, লোহা প্রভৃতি নানা ধরনের মৌল ও যৌগঅণু এবং বহু আয়নিত অণুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

বাঘের পাল্লায়

শ্রীবিজলী সরকার

আমার মেসোমশাই ননীগোপাল বাবু ছিলেন ফরেস্ট অফিসার, অর্থাৎ বন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। অনেক দিন আগেকার কথা। তিনি তখন ছিলেন সুন্দরবনে। সেই সময়কার একটি ঘটনা, তাঁরই কাছে শোনা। কাজেই সত্যি বলেই ধরে নিতে পারা যায়।

মেসোমশাই-এর এক বন্ধু ছিলেন বিনয় বাবু। বাঘ দেখার তাঁর ভারি সাধ। চিড়িয়াখানায় খাঁচা-বন্দী বাঘ নয়, খোদ জঙ্গলে-ঘুরে-বেড়ানো বাঘ। মেসোমশাই সুন্দরবনে আছেন জেনে তিনি তাঁকে কলকাতা থেকে চিঠি লিখলেন,—ওখানে বাঘ দেখতে যাবেন। মেসোমশাই চিঠির উত্তর দিলেন। অবশ্যই তিনি আসতে পারেন। তবে বাঘ দেখাটা ভাগ্যের কথা। আরও জানালেন, পথে হাঁটতে হাঁটতে যদি সন্ধ্যা হয়ে যায় তা হলে কারুর বাড়িতে যেন উনি সেই রাতের মত আশ্রয় নেন। কারণ সন্ধ্যা হলেই বাঘেরা ভ্রমণে বার হয়। এখানে নিয়ম আছে, সন্ধ্যার পর কেউ কারো বাড়ি আশ্রয় চাইলেই তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়।

বিনয় বাবু চিঠি পাওয়া মাত্রই রওনা দিলেন। সুন্দরবনে যেতে হলে নদী পার হয়ে যেতে হয়। আবার মেসোমশাইয়ের বাংলোটা ছিল নদীর ধার থেকে অনেকটা ভেতরে। সুতরাং নদী পার হয়েও অনেকখানি পথ হাঁটতে হবে।

বিনয় বাবু হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছেন। যেতে যেতে দেখলেন সূর্যদেব তাঁর লাল ওড়নাখানি মুড়ি দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। কাজেই তাঁকে আজ রাতের মত একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। আশ্রয়ের সন্ধানে পথের দু'ধারে চাইতে চাইতে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন। ওখানে তখন মানুষের বসবাস কম, অনেকটা ছাড়া ছাড়া এক একটা বাড়ি। বাড়িগুলি সবই মাটির। এখন অবশ্য কিছু ইটের বাড়িও হয়েছে, মানুষের বসবাসও বেড়েছে। কিন্তু আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে ও-সব ছিল না।

কিছুটা এগোতেই বিনয় বাবু দূর থেকে একটি বাড়ি দেখতে পেলেন। কাজেই দেরী না করে পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তে লাগলেন।

বাড়িটি দেখে বাড়িওয়ালাকে বেশ অর্থশালী এবং রুচিবান্ ব্যক্তি বলেই মনে হ'ল তাঁর। বাড়িটি যদিও মাটির, কিন্তু বেশ বড়। শাল-সেগুনের কাঠ দিয়ে বেশ মজবুত করে তৈরি করা। আশেপাশে নানা জাতের ফুলগাছও লাগানো আছে। ঘরের পর ঘর দিয়ে সারা বাড়িটি ঘেরা। একটি ঘরের দরজা বাইরের দিকে। সেই দরজার সংলগ্ন একটি দাওয়া। দাওয়াটির তিন দিক্ ঘেরা, সামনের দিক্‌টা শুধু খোলা। ছাদের ছাউনি টিনের। একটি কাঠের চৌকিও পাতা আছে দাওয়ায়। মনে হয় সদর হিসেবে ব্যবহার করা হয় দাওয়াটি।

কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক ভদ্রলোক ঐ বাইরের দরজাটি খুলে দাওয়ায় বেরুলেন। ভদ্রলোক ঠিক বলা যায় না; তবে ওখানকার হাবভাব তো একটু আলাদা, কাজেই ঠিক মত বোঝাও যায় না। তবে বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। লোকটি বললেন, "কি দরকার?"

বিনয় বাবু যত দূর সম্ভব বিনয় প্রকাশ করে রাতের মত আশ্রয় চাইলেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ না-সূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, "আমার এখানে অসুবিধে আছে।"

বিনয় বাবু চিন্তা-মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন, "কেন? আপনারা তো রাতের আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেন শুনেছি।" বিনয় বাবু জানতেন, এই নিয়ম এখানে আছে। রাতের আশ্রয়প্রার্থী যে-কোন বাড়িতে আশ্রয় চাইলেই তা পাবে। মেসোমশাইয়ের কাছেই তাঁর শোনা।

"হ্যাঁ, আগে দিতাম, এখন দিই না। কারণ ঐ সুযোগে কয়েকবার আমার অনেক কিছু চুরি হয়ে গিয়েছে মশাই! তবে এখানে যদি থাকতে পারেন, থাকুন; আমার কোন আপত্তি নেই।" বলে ঐ খোলা সদর দাওয়াটি দেখিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। আরো বললেন, "এই সদর ঘরেই আমি থাকব, দরকার হলে ডাকবেন।" বলেই উনি আর দাঁড়ালেন না, দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেলেন। একটি আলোও দিলেন না, চাইবার সুযোগও দিলেন না।

মনে মনে হেসে ফেললেন বিনয় বাবু। মাঝ রাতে বাঘ এসে যদি তুলে নিয়ে যায়, তখন আর কে কাকে ডাকবে? তিনি যদিও খুব সাহসী ছিলেন তবুও কেমন যেন তাঁর ভয় করতে লাগল। ভয় করা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক, বাঘের সঙ্গে মানুষ বিনা অস্ত্রে কতক্ষণ যুঝবে? আর একটু এগিয়ে গিয়ে যে অন্য কোন বাড়ি খুঁজবার চেষ্টা করবেন তা তাঁর সাহস হ'ল না। কারণ, তখন সন্ধ্যা উতরে গিয়েছে।

বিনয় বাবু কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর আর কোন উপায় না দেখে, সেই সদর দাওয়াতেই তাড়াতাড়ি আগে মশারিটা টাঙিয়ে ফেললেন। বিছানা, মশারি তাঁর সঙ্গেই ছিল। এই সব ক্ষেত্রে মশারি নাকি বিপদের হাত থেকে খানিকটা রক্ষা করে, এ কথাটা উনি কোথা থেকে নাকি শুনেছিলেন। মশারির ভেতরে ঢুকে কোন রকমে বিছানাটা পাতলেন; তার পর বিছানার মাঝখানে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। এইভাবে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেবেন ঠিক করলেন। যদিও খাবারদাবার সঙ্গেই ছিল, তবুও তা খাওয়া হ'ল না, খিদে তখন মাথায়।

একটা সুবিধে ছিল। তিথিটা সেদিন ছিল পূর্ণিমা, কাজেই চাঁদের আলোয় চারিদিক্ দিনের মত পরিষ্কার। বিনয় বাবুর মনে হ'ল, যাক, দুষমণের সঙ্গে যদি লড়তে হয় অন্ধকারে লড়তে হবে না এই একটা সুবিধে।

বিছানার মাঝখানে বসে একটার পর একটা সিগারেট পুড়িয়ে চলেছেন তিনি। এইভাবে ঘণ্টা দুয়েক কাটাবার পর, হঠাৎ ধুপ্ করে একটা আওয়াজ হ'ল। সেই সঙ্গে একটা বোট্‌কা গন্ধও তাঁর নাকে এল, আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল একটা মাঝারি গোছের বাঘ তাঁর বিছানা থেকে হাত আষ্টেক দূরে বসে আছে তাঁরই দিকে চেয়ে। বিনয় বাবুর হাত-পা তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বিনয় বাবু শুনেছিলেন বাঘ আগুনকে ভয় করে, কাজেই তিনি প্রাণপণ শক্তিতে সিগারেটটা টানতে লাগলেন। বাঘটা ঐ ভাবে কিছুক্ষণ বসে, হঠাৎ এক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিনয় বাবু আর কি তখন বিছানায় থাকেন? তড়াক্ করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এলেন; তার পর বাড়িওয়ালার দরজায় দমাদ্দম্ ধাক্কা দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। তখন কি করবেন, কোথায় লুকোবেন? চরিদিক্ চাইতে চাইতে খুঁজতে লাগলেন। ভয়ে তখন তাঁর হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

এমন সময় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, দাওয়ার টিনের ছাউনির তলায় অনেক বাঁশ কাঠ দিয়ে বেশ মাচার মত করে সাজানো রয়েছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করে কোন রকমে তার ওপর উঠে পড়লেন।

ওঠার কিছু পরেই একেবারে তিন তিনটে বিরাট বিরাট বাঘ এসে হাজির হ'ল তাঁর বিছানার কাছে। তিনি মাচার কাঠকুটোর ফাঁকে চোখ রেখে দেখতে লাগলেন। বিছানাটা ওরা শুঁকতে শুঁকতে দু'-চার বার পায়চারি করল, তার পর ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। বিছানাটা ছিঁড়ে একেবারে কুটি কুটি করে ফেলল।

এই ভাবে কিছুক্ষণ দাপাদাপি করবার পর আর কেন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। তার পর গৃহস্বামীর দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তিনি দরজা খুলে লাঠি হাতে করে সবে বেরুচ্ছেন, ব্যস্, আর যায় কোথায়! ভীষণ ভাবে চীৎকার করে উঠলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ধুপধাপ আওয়াজ—পরক্ষণেই আবার সব চুপচাপ।

বাড়ির মধ্যে হঠাৎ কান্নাকাটি হৈ-চৈ পড়ে গেল। বিনয় বাবু মাচার ওপর নিঃশব্দে বসে রইলেন ভোর হবার অপেক্ষায়। ভোর হতেই মাচা থেকে নেমে চোঁ-চা দৌড়। ওরা যদি জানতে পারে যে উনি বাঘের পেটে যান নি, তা হ'লে হয়তো ওঁকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। কারণ বিনয় বাবুকে পায় নি বলেই বাঘেরা ঐ স্থান ছাড়ে নি, শিকার ফিরে আসবে ভেবেই হয়তো আশেপাশে কোথাও অপেক্ষা করছিল। আর তার ফলে গৃহস্বামীর ভবলীলা সাঙ্গ হ'ল।

মেসোমশাইয়ের বাংলোয় গিয়ে হাঁপাতে লাগলেন বিনয় বাবু। কোন কথাই বলতে পাচ্ছেন না। মেসোমশাই তো তাঁর অবস্থা দেখে অবাক্।

তার পর শান্ত হতে, সমস্ত কথা তার মুখে শুনে, মেসোমশাই বললেন, "ও, একটু আগে ওরাই তা হ'লে এসেছিল ওদের বাঘে-নিয়ে-যাওয়া বাবাকে উদ্ধার করবার জন্য। তুমি শেষে বেছে বেছে ওদেরই হাতে পড়েছিলে? তবে তুমিই বা জানবে কি করে ওদের ব্যাপার? ও ব্যাটারা ভীষণ পাজি। ঐ ভাবে ওরা কয়েকজনকে বাঘের পেটে দিয়েছে, আজ নিজেকেই যেতে হ'ল।"

"কিন্তু অতিথিদের বাঘের পেটে দিয়ে ওদের লাভ?"—বিনয় বাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"লাভ এই যে তোমাকে বাঘে নিয়ে গেলে, বাঘ তো আর তোমার ঘড়ি, আংটি, বোতাম, টাকাকড়ি খেত না; সকালে ওরা গিয়ে খুঁজে খুঁজে ঐগুলো নিয়ে আসত। ও লোকটা নাকি এ রকম অনেক দিন থেকেই করে আসছিল, তবে ঠিক মত প্রমাণ পাওয়া যায় নি বলে এতদিন কিছু করাও যায় নি।"

"কিন্তু রাত থাকতেই ও দরজা খুলে বেরুল কেন?"

"ও নিশ্চয়ই ভেবেছিল, তোমাকে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে। তোমার মশারির মধ্যে বিছানায় হুটোপাটি হয়ে তার পর থেমে গেল। তাই ও নিশ্চিন্ত হয়েই বেরিয়ে পড়েছিল। ভগবান্ই ওর পাপের শাস্তি দিলেন।"

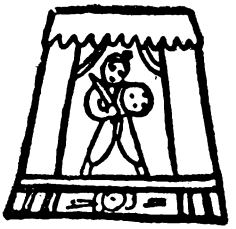

শিশুরংমহলের আসর

মনে পড়ে

সমর চট্টোপাধ্যায়

মোটর সাইকেলে কলকাতা থেকে কাশ্মীরের পথে চলেছি চার বন্ধু। ইতি-মধ্যে আগ্রা আর ফতেপুর সিক্রী পেরিয়ে এসেছি। এর পরেই দিল্লী।

দিল্লী পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বেয়ার্ট রোডের বাড়িগুলিতে আলো জ্বলে উঠছে। আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে গাড়িগুলো রেখে শহর দেখতে বেরুলাম।

১৯২৫ সালের কথা বলছি। দিল্লীতে তখন এত ভিড় ছিল না। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটি বাড়ি। বেশির ভাগই একতলা। ঘুরে ঘুরে তাই দেখতে লাগলাম। পুরানা দিল্লী শহরে অবশ্য খুবই ঘন বসতি। ছোট ছোট গলি, পুরোনো আমলের সরু সরু ইট দিয়ে গাঁথা বাড়ি। পাথরে তৈরি বাড়িরও অভাব নেই। লোকের ভিড়। দু'খানা টঙ্গা মুখোমুখি চলবার সময় প্রায়ই চাকায় চাকায় আটকে যায়। আমরা সেদিক্‌টায় বেশি যাবার সময় পাই নি।

পরদিন স্যাম সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'ল। সাহেব বললেন, "আমি আশা করেছিলাম তোমাদের দাড়িগোঁফ থাকবে। এঃ, একেবারে "ক্লীন্-শেভ্‌ড্ জেণ্টল-ম্যান্" হয়ে সবাই এসেছ! তোমরা যে ট্যুরিস্ট তা লোকে বিশ্বাস করবে কেন?"

আমাদের মুখে কোনো উত্তর যোগাল না।

দিল্লী তখন একটি পুরোপুরি ঐতিহাসিক শহর। পাঠান আর মোগল যুগের নানা স্মৃতিচিহ্ন দিল্লী আর তার আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। হিন্দু আমলেরও আছে, তবে তুলনায় তা সামান্য। কোন কোন জায়গায় হিন্দু স্থাপত্যের ওপর মুসলিম স্থাপত্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্মৃতিচিহ্নগুলির মধ্যে কতক অত্যন্ত সুরক্ষিত—যেমন লাল কেল্লা, মোতি

মস্‌জিদ, জুম্মা মস্‌জিদ, কুতুব মিনার, রায় পিথোরার মন্দির ও লৌহস্তম্ভ, যন্তরমন্তর বা মানমন্দির ইত্যাদি। এক জায়গায় অশোক স্তম্ভ। ফিরোজশাহ্‌'র কোটলার ওপরেও রয়েছে একটি অশোকস্তম্ভ। কাশ্মীরী গেটকে খুব জমকালো করে দেখানো হচ্ছে—সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরেজের বীরত্বের চিহ্ন হিসেবে। রিজের ওপর ক্লক্ টাওয়ার।

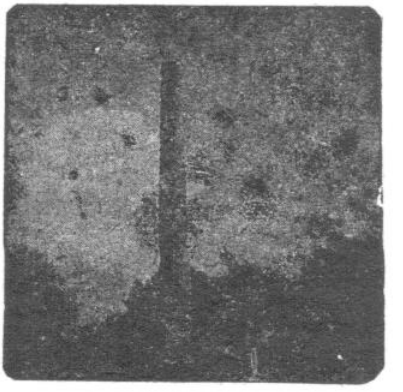

অশোক স্তম্ভ, দিল্লী

ইংরেজ রাজত্ব তখন জাঁকিয়ে চলছে। কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী নিয়ে আসা হয়েছে এই বাদশাহী শহরে—বছর চৌদ্দ আগে। বড়লাট থাকেন টিমারপুরে,—পরে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় চলে আসে। নতুন দিল্লী তখন কোথায়? তার পত্তনই শুরু হয়েছে কিনা ঠিক নেই।

কুতুব মিনার

ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলোর কিছু দেখা হ'ল, অনেক কিছুই হ'ল না। অত সময় পাচ্ছি কোথায়? তবু তার দু'-চারটে ছবি এখানে দিয়ে দিচ্ছি।

তিনদিন দিল্লীর বেয়ার্ট রোডের বাড়িতে ছিলাম। তারপর পানিপথ, কুরুক্ষেত্র (দু'টিই বিখ্যাত রণাঙ্গন, আমাদেরও তো রণবেশ! হয়ে আম্‌বালায়। আগে কথা ছিল পাতিয়ালার এক প্রফেসরের বাড়িতে উঠব। কিন্তু তাঁর বাড়িতে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যাওয়ায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হ'ল স্থানীয় কালীবাড়িতে। কালীবাড়িতেই রইলাম।

এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীও ছিলেন ঐ কালীবাড়িতে। তখন দুর্গাপূজা সবে

শেষ হয়েছে। আমরা বারান্দায় শুয়ে পড়েছি আর কার্ত্তিক গণেশের গল্প শুনছি।

গণেশ কালীবাড়িতেই ছিল। সে বলল, তার ভাই কার্ত্তিক। তারা ভগ্নীপতির বাড়িতে থেকেই লেখাপড়া করত। ওদের ভগ্নীপতি পাতিয়ালা কলেজের প্রফেসর ছিলেন। সেই প্রফেসরকে কারা মেরে ফেলে, আর তার দায় পড়ে কার্ত্তিকের ওপর। কেননা কার্ত্তিককে পরদিন হাত-পা-ভাঙ্গা অবস্থায় প্রফেসরের বাড়িতে পাওয়া যায়।

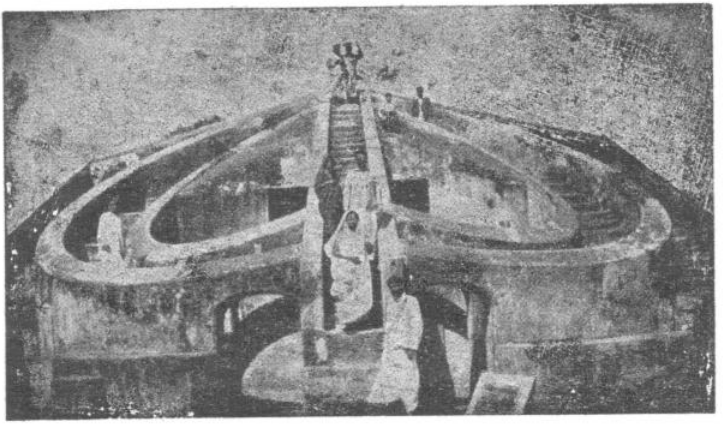

যন্তর মন্তর

আমি কার্ত্তিককে দেখেছি। তার বিচার হয় পাতিয়ালা হাইকোর্টে। তবে পরে সে ছাড়া পায়।

গণেশ বলেছিল থাকতে, কিন্তু আমাদের যে বড় তাড়া! তাই অপেক্ষা না করে আমরা ওয়াজিরাবাদ হয়ে শিয়ালকোটে চলে এলাম।

শিয়ালকোটে সর্দার শার্দুল সিং ওবেরয়ের বাড়ি। শার্দুল সিংএর ফ্যাক্টরী দেখলাম। অনেক হকি স্টিক, ক্রিকেট ব্যাট আর বল তৈরি হচ্ছে।

আমাদের দেখাশোনা করছিলেন একজন বাঙালী। তাঁর নাম মিঃ মজুমদার। দেখলাম সে আমলেও আমাদের দেশে ব্যাট, বল তৈরি হচ্ছে, তবে কিছুটা নীচু মানের।

শিয়ালকোট থেকে জম্মু যেতে ১২ মাইল। ফ্রন্টিয়ার টাউন সুতেজগড়।

এদিকে ইংরেজের সৈন্য, আর ওদিকে কাশ্মীরের রাজার সৈন্য। আমাদের ইংরেজি কাগজপত্র সব দেখল ইংরেজ কম্যাণ্ডার। দেখে বলল, তোমরা আবার ওয়াজিরাবাদ হয়ে পেশোয়ার যাও, কাশ্মীর যেও না। লালকুর্তারা ধরিয়ে দেবে।

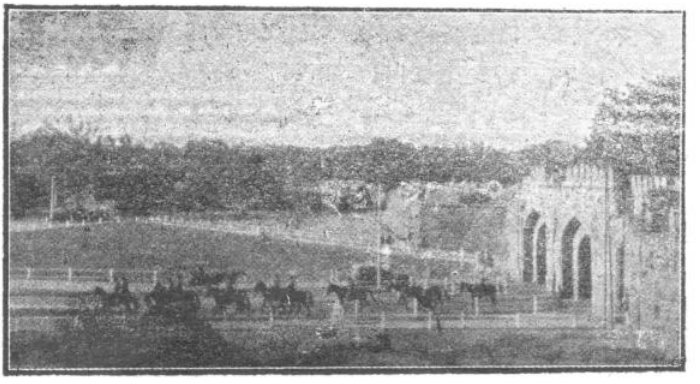

কাশ্মীর গেট, দিল্লী

আমরা 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে যেন ভুল করেই জম্মুর রাস্তা ধরলাম। কিছু দূর গিয়ে জম্মু পৌঁছলাম।

তখন ৯টা বাজে। আমরা কাশ্মীরের পথে উদামপুর চলেছি উদামপুরে আমরা সন্ধ্যা সাতটায় পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের একটা গোয়াল ঘরে থাকতে দিল। সারা রাত আমাদের মশার কামড় খেয়ে কাটল। তবে রাত্রে আমাদের খাবারটা ভালোই ছিল। উদামপুরের দেবতার প্রসাদ।

এরপর আমরা বেটট পৌঁছলাম। বিকেলেই জাঁকিয়ে শীত পড়ল। আমাদের ওখান থেকে পাহাড়ী দস্তানা কিনতে হ'ল। রাত্তিরে বানিহাল ডাক-বাংলো। এবার একটু বিশ্রাম দরকার। বিশ্রামের পক্ষে এই ডাক-বাংলো লোভনীয়।

ঝিলমের পাড়ে শ্রীনগর

বানিহাল খুব সুন্দর জায়গা। চারদিকে পাহাড় ও মধ্যে চম্বল উপত্যকা। অসংখ্য বাড়ি. তবে সব তাঁবুর।

আমরা ঠিক করলাম এই বানিহালেই রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোরে শ্রীনগর রওনা হব। কারণ, এ পথে যেতে হলে আমাদের খুব উঁচু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তবেই শ্রীনগরে পৌঁছতে হবে। দিনের বেলাই সেটা সুবিধাজনক হবে।

তখনও সুড়ঙ্গ পথ তৈরি হয় নি, সুড়ঙ্গ হয়েছে ভারতীয় আমলে—ভারত স্বাধীন হবার পর। আমরা ১৬,০০০ ফুট উঠে, পাহাড়ের ওপর দিয়ে নেমে সন্ধ্যে বেলা শ্রীনগর পৌঁছলাম।

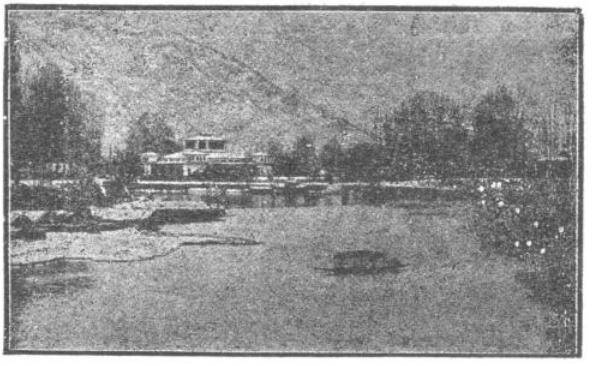

শীতের কাশ্মীর

তখন নভেম্বর মাস। ঠাণ্ডা পড়েছে খুব। আমরা ওখানকার নামকরা বাঙালী মিঃ কাঞ্জিলালের কাছে গেলাম। উনি তখন শ্রীপ্রতাপ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। উনি তো আমাদের পত্রপাঠ বিদায় করে দিলেন। তখন মনে পড়ল, উনি যখন দেশে আসেন তখন সুরেন দাশগুপ্তের বাড়িতে থাকেন। সুরেন দাশগুপ্ত লাহোরের বিখ্যাত আধ্যাপক ছিলেন। আমরা সুরেন দাশগুপ্তের লেখা একটা চিঠি ওঁকে দিলাম। তখন অবশ্য আর অপত্তি করলেন না।

কাঞ্জিলালের ছোট ছেলে আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন—গাদা গাদা লেপ-কম্বল দিয়েছিলেন। ওখানে তখন এত ঠাণ্ডা যে আমরা জামা-কাপড়, জুতো-মোজা, টুপি সব প'রেই ঘুমিয়েছিলাম।

শ্রীনগরে আমরা ছিলাম সবশুদ্ধ চারদিন। ঐ চারদিনেই যা দেখার দেখে শ্রীনগর ছেড়ে এলাম।

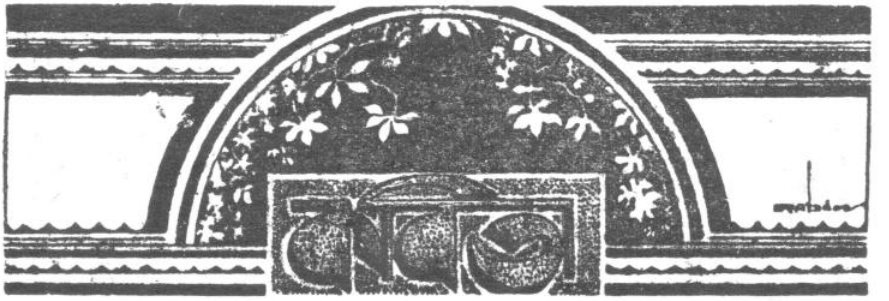

ছড়া হলেও সত্যি

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

এই যে দাদা, একটা কথা
বলছি শুনুন বাস্তবেই,
চার আনা ভাগ ফিরলে বরাত
পাবেন পথে বাস্ তবেই।

ভাগ্য ফিরলে বারো আনা
গুরুদেবের মন্তরে
বসার 'সীট'ও পেয়ে যাবেন
জাগবে পুলক অন্তরে।

আরও বেশি ফিরলে কপাল
আট আনা ভাগ অন্ততঃ
চড়তে পাবেন সেই বাসেতে
আর সুখ চান কন্ কত?

ফিরলে বরাত ষোল আনাই
আপনি সুখের স্বর্গেতে
সেই বাসেতেই চাপা প'ড়ে
পৌঁছে যাবেন মর্গেতে।

ডাকাডাকি

শ্রীঅরুণজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়

গোরু ডাকে হাম্বা—
ঘোড়া ডাকে চিঁহি যে,
পুষি ডাকে মিউ মিউ—
ওর গলা মিহি যে!

বাঘের হালুম ডাক—
শেয়ালের হুক্কা,
গুড়ু গুড়ু ডাকে শোন
দাদুর ঐ হুঁক্কা।

সিংহের হুংকারে
গা-টা করে ছম্‌ছম্‌,
বাদলের ধারা শোন
ঝম্‌ঝম্‌ ঝম্‌ঝম্‌।

হাড়ু ডুডু কিৎ কিৎ—
বানরের হুপ্‌ হুপ্‌,
বৈশাখী ঝড়ে পড়ে
কাঁচা আম ধুপ্‌ ধুপ্‌।

মাছি ডাকে ভ্যান ভ্যান—
রাতে মশা কুন্‌ কুন্‌,
ভোমরার ভোঁ ভোঁ ডাক—
মৌ ডাকে গুন্‌ গুন্‌।

হাসিখুশি খিল্‌খিল্‌
ঘর ঘুরে হামা সে,
ডাকে বুঝি চাঁদা মামা
ঝিকিমিকি আকাশে।

চেয়ে দেখো

কঙ্কাবতী মিত্র

ঐ দেখো দূরে কালো মেঘে আজ নীলাকাশ গেলো ঢেকে,
বৃষ্টি আজকে জোরে নেমে যাবে আমাদের ডেকে ডেকে।
মেঘগুলো আজ ক্ষেপে গিয়ে তাই ভুলে গেছে পথঘাট—
নীচেতে রইলো ধূধূ-করা এক সবুজ ঘাসের মাঠ।
ছোট মেয়েদের ভিজবার পালা আসবে কেমন করে?
ধুলো উড়ে যায় চেয়ে দেখো তুমি, ঐ রাস্তার মোড়ে।
এই তো এখনি শুরু হয়ে যাবে রিমঝিম সুরে গান,
পাখিরা খুশিতে শুরু করে দেবে ভিজে ভিজে মহাস্নান!

দম্‌কা হাওয়ায় গাছের শাখাটা হঠাৎ উঠলো দুলে;
ঐ দেখো কোন্‌ ক্ষ্যাপা ছুটে আসে মহা কলরোল তুলে!
সবাই বুঝলো ভয়ানক জোরে ঝড় উঠে গেছে আজ,
বুঝলো না শুধু বোকা কুকুরটা,—নেই তার কোনো কাজ।
তুমি মনে করো, আমিও কি শুধু কাজহীন হয়ে থাকি?
হুঁ-হুঁ, তাই নয়, অনেক অঙ্ক কষতে রয়েছে বাকি!

আপনি আচরি' ধর্ম

শ্রীকাঞ্চন

কোটিতে গুটিক নয়. হাজারে, নয়তো অন্ততঃ লাখে কিছু আছেনই ছড়িয়ে ছিটিয়ে—যাঁরা "আপনি আচরি' ধর্ম" কথাটা আজও হয়তো বিশ্বাস করেন। তাঁরা এক একজন নির্বিকল্প বুদ্ধ ন'ন ঠিকই, তবে বুদ্ধুও যে ন'ন সে সম্বন্ধে অতি বড় অবিশ্বাসীও বোধ হয় বাজী রাখতে পারেন। সত্যি কথা বলতে গেলে তাঁরা এক একজন যেন আজকের দিনের বিশাল ধূধূ-করা মরুপ্রান্তরে এক এক টুকরো মরূদ্যানের শান্তি।

এই রকম ২।৪টি লোকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল আমার নিতান্ত ঘটনাচক্রেই। তারই কথা শোনাচ্ছি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা। কলকাতা শহরের জনাকীর্ণ একটা চৌরাস্তার ভিড়। একটি আধুনিক সিনেমা হল। হলের সামনের ভিড়ের কথা না বলাই ভালো। যথারীতি চানাচুর, চীনেবাদামওয়ালারা সব কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে তারস্বরে মাতিয়ে রেখেছে পরিবেশ। শো আরম্ভ হতে অল্পই বাকি। উত্তর-তরুণ এক ভদ্রলোক এক বন্ধুর সঙ্গে চীনেবাদাম কিনছেন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে।

ঠোঙ্গা দু'টো হাতে নিয়ে বাদামওয়ালার হাতে একটা দু'-পয়সা গুঁজে দিয়ে বললেন, "দু'টো খালি ঠোঙ্গা দাও দেখি ভাই!"

বন্ধুটি বিরক্ত হ'ল কিনা জানি না, তবে অবাক্ হয়েই লুফে নিল কথাটা।—"কি হবে?"

খালি ঠোঙ্গা দু'টো নিয়েই পিছন ফিরলেন ভদ্রলোক মুচকি হেসে।—"হবে আবার কি? খোসা ফেলব। ঘরের মেঝেটা নোংরা করে লাভ কি বল্? নে, আয়—"

ঠিক তক্ষুনি বাদামভর্তি একটা ঠোঙ্গা আমার হাতেও ধরিয়ে দিয়েছিল চীনেবাদামওয়ালা। বাড়তি একটা ঠোঙ্গা কিনতে কেমন যেন লজ্জাই করছিল তখন।

কিন্তু লজ্জা যায় নি। সিনেমা দেখতে দেখতে মেঝেতে চীনেবাদামের খোসা আমার পক্ষেও ফেলা সম্ভব হয় নি সেদিন। শো-র শেষে রাস্তায় একটা নোংরা ফেলার ডাস্টবিনের সামনে দাঁড়িয়ে একটু এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে পকেট উল্টে খোসাগুলি ফেলেই একটা চলতি বাসের পাদানীতে লাফিয়ে উঠেছিল এই অধম।

* * *

কলকাতা শহরতলীর অঞ্চল। রাজনৈতিক ভয়াবহ উত্তেজনার সময়। গেছি এক আত্মীয়ের বাড়ি বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। সঙ্গে স্ত্রী। ওখানে আগে কখনো যাই নি বলে রিক্সাওয়ালার ওপরই কলোনীর রাস্তা চেনাবার ভার ছিল। সন্ধ্যে হয় হয়।

ঠিকানামাফিক মোটামুটি রাস্তার যে অংশে গিয়ে পৌঁছলাম দেখি সেই অঞ্চলটা প্রায় ফাঁকা। দু'-একটা বাড়ি এদিকে ওদিকে আছে বটে, কিন্তু আত্মীয়টির বাড়ির বর্ণনা অনুযায়ী মিলছে না। খানিক দূরে একটা পুরেনো সিংহদরজার মত। দু'পাশে দুটো পাথরের বেঞ্চি। পাঁচ-ছয়টি অল্পবয়স্ক যুবক বসে

গল্প করছে। ভেতরে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। দু'-একটা পুরোনো পাম্ গাছও যেন দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। রিক্সাওয়ালার তাড়ায় ইতিমধ্যেই তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় খানিক দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু এই সন্ধ্যেবেলা, অচেনা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। আর দিনকালটাও তো—! যা থাকে কপালে ভেবে ছেলেগুলির দিকে এগিয়ে চললাম।

একটু এগুতেই ছেলেগুলিই উঠে কাছে এল। ঠিকানাটা তাদের বলতেই তারা নিজেদের মধ্যে কি যেন বিড় বিড় করে তার পর বলে উঠল, "আচ্ছা, আসুন তো—!" খানিক দূর গিয়েই আবার বলল, "দাঁড়ান এখানে।" তার পরেই যেন ম্যাজিক—ছেলেগুলো হাওয়া। কি করব ভাবছি, তেমনি ম্যাজিকের মতই হঠাৎ ওদের আবির্ভাব। বলল, "ওঁরা এখন এখানে থাকেন না। আসুন।"

কি করব বুঝে উঠতে পারলাম না। একটা ভয়ও হচ্ছিল যেন। এ আবার কাদের পাল্লায় পড়লাম! যা হোক, এখন আর ভেবে লাভ নেই। তাদের কথামত এ-বাড়ি ও-বাড়ির পিছন দিয়ে এ-গলি ও-গলি, কাঁচা নর্দমা ইত্যাদি ডিঙ্গিয়ে প্রায় আধঘণ্টা পরে ঠিক জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছলাম।

আত্মীয়টি এ সময়ে আমাদের দেখে অবাক্। আমিও ততোধিক ছেলেগুলির দিকে তাকিয়ে। তারা হাসছে তখন মিটিমিটি। বিস্মিত ভাবটা কাটিয়ে তাদের বললাম, "ভাই তোমাদের কি বলে যে—"

একজন চট্ করে বলে উঠল, "না না স্যর, এ তো আমাদের ডিউটি।" সর্বাধিক লম্বা, রুক্ষ, চোয়াড়ে চেহারার ছেলেটা হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল, "এখনো ততটা খারাপ হই নি স্যর! একটু ভালোবাসা পেলে—চলি স্যর! চল রে, চল।"

ব্যঙ্গ করল কিনা ছেলেটি কে জানে? অন্ধকার তো, মুখটা দেখি নি তার।

আমার মুখের রেখাগুলি আমিই কি দেখেছি?

* * *

মেডিক্যাল কলেজে ব্লাড ব্যাঙ্কের সিঁড়ির শেষ ধাপের পূবদিক্ ঘেঁষে একটা ছোট্ট জটলা। কৌতূহলী দৃষ্টি সবার, একটু ব্যথিতও বা। কেউ দাঁড়াচ্ছে, কেউ বা উঁকি দিয়েই—"চল চল" বলে চলে যাচ্ছে আপন পথে, আবার কেউ বা জটলা দেখে আর ভেতরে কান্নার রেশ শুনে—"আহা রে! কে জানি মারা গেল!"—বলে ভিড়ের দিকে তাকাতে তাকাতেই চলে যাচ্ছে।

ভিতরে আধবয়সী একটি রোগা লোক, কাঁধে পাট করা একটা দোমড়ানো জামা, খালি গা, দেখতে গ্রামের মানুষ বলেই মনে হয়—ঠাঁই ঠাঁই করে কপাল চাপড়ে চীৎকার করে কাঁদছে। পাশে বোধ হয় তারই স্ত্রী, একগলা ঘোমটা টেনে সেও ফুঁপিয়ে চলেছে।

হঠাৎ পথ-চলতি তিনটি ছেলে, সুন্দর পেটানো এক্সারসাইজ-করা শরীর,—থমকে দাঁড়াল, তারপর তাদের একজন ভিড় ঠেলে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?"

চকিতে লোকটি চীৎকার করে ওঠে, "বাবু গো, আমার পাঁচ কুড়ি জমি-বেচা ট্যাকা – হাসপাতালে ছেলেটার রক্ত কিনব বইলে এইনেছিলুম। গাঁটকাটায়—" বলেই ও-হো-হো-ও করে আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তার মধ্যেই আবার বলে, "ডাক্তার বইলেছিল, রক্ত না দিলে তোমার ছেইলে বাঁইচবে না—।"

ছেলেটি হঠাৎ আপন মনেই বিড় বিড করে উঠে, "রক্ত! তোমার ছেলের জন্য?" পরক্ষণেই কি মনে করে গম্ভীর গলায় ফেটে পড়ে উপস্থিত জনতার প্রতি। "যান, হাঁটুন, কি দেখছেন সব? যান।"

মুহূর্তে ভিড় পাতলা হয়ে যায়।

মানুষের কৌতূহল বড় সাংঘাতিক। অবশ্য না হলে জানাই যেত না ঘটনাটা।

ছেলেটি লোকটিকে সঙ্গে করে নিয়ে ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়ে নিজের রক্ত জমা দিয়ে তক্ষুণি তার ছেলের রক্তের ব্যবস্থা করে দিল। অন্য বন্ধুরাও একটু দোনামনা করে এগিয়ে এসেছিল—ঐ মুহূর্তে, নিজের থেকেই।

যাবার সময় ছেলেটি লোকটিকে বলেছিল, "যাও, কেঁদো না।"

এর পর লোকটি কেঁদেছিল কিনা জানি না, তবে আমার কৌতূহল-ভরা চোখ দু'টি ছলছল করে উঠেছিল তখন।

যে গল্প চিরকালের

শ্রীকৌটিল্য

আট

"চরকে সঙ্গে নিয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য চিত্রকূট পর্বতের কাছে সেই আশ্চর্য তপোবনে এসে হাজির হলেন।

"তপোবন দেখে রাজা মুগ্ধ হলেন, বললেন, 'এমন সুন্দর—এমন পবিত্র স্থান আমি কমই দেখেছি। এই দেবালয়ে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবতী অধিষ্ঠান করেন। এখানে এলে মানুষের মনও পবিত্র হয়। আমার মনও আজ পবিত্র হ'ল।'

"তারপর বিক্রমাদিত্য সেই ঝরণার জলে স্নান করলেন। এই জলে স্নান করলে শরীর নিষ্পাপ হয়, সমস্ত পাপতাপ ধুয়ে চলে যায়। স্নান শেষ হলে বিক্রমাদিত্যের মনে হ'ল তিনি সমস্ত পাপতাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলেন, মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দর্শন করে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

"অনতিদূরে সেই ব্রাহ্মণ হোমকুণ্ড জ্বালিয়ে তখনও অনর্গল হোম করে চলেছেন। রাজা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'প্রণাম হই দ্বিজ! আপনার হোমকার্যে

একটু বাধা দিচ্ছি, ক্ষমা করবেন। আমি শুনেছি আপনি দীর্ঘকাল ধরে এই হোম করে যাচ্ছেন—দেবতাকে প্রসন্ন করতে, কিন্তু দেবতা এখনও প্রসন্ন হন নি। আমি রাজা বিক্রমাদিত্য, আপনার কোন উপকারে লাগলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করব। আচ্ছা, কতদিন আগে আপনি এখানে হোম শুরু করেছিলেন?'

"ব্রাহ্মণ কারও সঙ্গে কথা বলেন না, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের নাম শুনে ফিরে তাকালেন। তার পর একটু যেন ভেবে উত্তর দিলেন, 'আমি যখন হোম শুরু করি তখন আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল রেবতী নক্ষত্রে সবে পা দিয়েছিল। এখন সেই তারাপুঞ্জ—সপ্তর্ষিমণ্ডল অশ্বিনী নক্ষত্রে এসে গেছে। হিসেব করে দেখুন কতদিন হয়। একশ' বছর তো নিশ্চয়ই। অথচ আজও দেবী আমার প্রতি ফিরে চাইলেন না!'

"ব্রাহ্মণের কথা শুনে বিক্রমাদিত্যের মনে হ'ল তিনি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখবেন। ব্রাহ্মণের অনুমতি নিয়ে তিনিও সেই হোমকুণ্ডে ব্রাহ্মণের কল্যাণ কামনা করে আহুতি দিলেন। কিন্তু তাতেও কিছু হ'ল না। তখন বিক্রমাদিত্য ভাবলেন, সাধারণ আহুতি দিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করা যাবে না, নিজের মাথা স্বহস্তে কেটে সেই শিরকমল দেবীকে আহুতি দিলে হয়তো তাঁর করুণা লাভ করা যেতে পারে। তিনি আর ইতস্ততঃ না করে কোমর থেকে তলোয়ার টেনে নিয়ে নিজের গলায় বসিয়ে দিতে গেলেন। অমনি অলক্ষিতে দেবী এসে তাঁর হাত দু'টি ধরে ফেললেন, বললেন, 'বিক্রমাদিত্য, তুমি সত্যিই বীর, সত্যিই মহান্। আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তা পূরণ করব।'

"বিক্রমাদিত্য বললেন, 'দেবি, আপনার অসীম দয়া। কিন্তু আমি ভাবছি আমার ওপর আপনি এত অল্প সময়ে প্রসন্ন হলেন, অথচ এই ব্রাহ্মণ এতদিন ধরে হোমে আহুতি দিয়েও আপনার মন পেল না, এ কেমন কথা

"দেবী সহাস্যে বললেন, 'এই ব্রাহ্মণ দীর্ঘদিন ধরে হোম করে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ও শুধু নিজের কথাই ভাবছে, পরের জন্য ওর কোন মাথাব্যথা নেই। শাস্ত্রে অনেক রকম জপতপের কথা আছে, কিন্তু তার সবগুলিই সফল হয় না। যে যেমন করে ভাবে, যেমন ভাবে উপাসনা করে তার সিদ্ধিও লাভ হয় তেমনি। মনের ভাবই সব রকম সিদ্ধির কারণ। মাটি-পাথর বা কাঠ দিয়ে লোকে দেবতার বিগ্রহ বানিয়ে তাঁর পূজো করে, কিন্তু সত্যিই তো তার মধ্যে দেবতা থাকেন না,—দেবতার অধিষ্ঠান হচ্ছে অন্তরের ভাবে। ঠিক ভাবে তাঁকে ডাকতে পারলে তিনি ঠিকই আসেন। কিন্তু সেই ঠিক ভাবে ডাকাটাই হচ্ছে কঠিন ব্যাপার। যাক, তুমি বর প্রার্থনা কর। তুমি যা চাইবে আমি তাই দেব।'

"রাজা বললেন, 'তা হলে আপনি এই ব্রাহ্মণের মনের বাসনা পূর্ণ করুন। ও হয়তো ঠিক ভাবে আপনাকে ডাকতে পারে নি, কিন্তু ওর উদ্দেশ্য তো ছিল আপনাকেই প্রসন্ন করা।'

"দেবী আবার হেসে বললেন, 'তুমি যখন তাই চাইছ তখন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এই ব্রাহ্মণ তার অভীষ্ঠ লাভ করবে। তবে তা তোমার গুণে—নিজের গুণে নয়। তুমি মহৎ, তুমি পরোপকারী। ভুলো না, পরের উপকার করার জন্যই সত্যিকার দেহধারণ। বনস্পতিরা পরের উপকারের জন্য ছায়া দেয়, ফল দেয়; নদী পরের উপকারের জন্যই বয়ে যায়; গাভীরা পরের উপকারের জন্যই দুগ্ধদান করে। নিজে সকল কষ্ট সহ্য করে পরের উপকার করার মত মহৎ কাজ আর নেই।'

"এই ভাবে বিক্রমাদিত্যকে বর দিয়ে দেবী অদৃশ্য হলেন। ব্রাহ্মণও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ায় রাজাকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন। বিক্রমাদিত্যও নিজেকে কৃতার্থ মনে করে রাজধানীতে ফিরে এলেন।"

গল্প শেষ করে দ্বিতীয় পুতুল প্রভাবতী ভোজরাজকে বললেন, "মহারাজ, আপনার যদি বিক্রমাদিত্যের মত ঐ রকম গুণ থাকে তবে সিংহাসনে বসতে পারেন।"

রাজার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। তিনি পুতুলটির দিকে তাকিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ

সুশীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত

সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র কেবল বড় লেখকই ছিলেন না, তাঁর রসবোধও ছিল চমৎকার। তা ছাড়া বন্ধুমহলে বা আত্মীয়মহলে হাস্যপরিহাস করতেও তাঁর জুড়ি ছিল না।

দামোদর মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর বেয়াই। তিনিও ছিলেন সাহিত্যিক। বঙ্কিম বাবুর একাধিক বইএর তিনি উপসংহার লিখে গেছেন। (কেউ কেউ অবশ্য ঠাট্টা করে বলতেন, উপসংহার তো নয়, পুরো সংহার। বেয়াই বলেই ছাড়া পেয়ে গেছেন।)

যাই হোক, দুই বেয়াইএ রহস্যালাপ কিন্তু খুব জমত। একদিন ওঁরা দু'জন বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় ঢালাও ফরাসের ওপর বসে সকলের সঙ্গে গল্প করছেন মশগুল হয়ে। ওঁরা ছাড়া আরো অনেক সাহিত্যিকও আছেন। ঘরের বাইরে দরজার কাছে সকলের জুতো জড় করা আছে। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে ব্যবহারের শুঁড়-তোলা তালতলার চটি জোড়াও সেখানে আছে। গল্প চলছে, এমন সময় দামোদর বাবু ঘরের বাইরে যেখানে সকলের জুতো খুলে রাখা হয়েছে সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন পাশের কোথা

থেকে যেন বেশ জলধারা গড়িয়ে আসছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শুঁড়-তোলা চটি পর্যন্ত জল এসে গেছে। তাই দেখে দামোদর বাবু বলে উঠলেন, যেন শিউরে উঠে, "আরে অ্যারে, এদিকে বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেল রে!" সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে বলে উঠলেন, "আর যাবে কোথায়? বেশি দূর যাবে না। দামোদর মুখো হয়ে যেতে হবে তো!" (দামোদর তাঁর ঐ বেয়াইএর নাম, আবার বিখ্যাত নদীও।)

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যের সঙ্গে যেমন কৌতুক করতেন, তাঁকেও কেউ কেউ ছেড়ে কথা কইতেন না, তাঁর কথার যথাযথ উত্তরও তিনি পেতেন। বঙ্কিম অবশ্য সে পরাজয় স্বীকার করে মৃদু মৃদু হাস্যে উপভোগ করতেন।

কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন উপস্থিত কবি,—কোন কবিতা বলা মাত্রই মনে মনে ফরমাস মতো পাল্টা কবিতা রচনা করে দিতে পারতেন। তিনি থাকতেন বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়ার বাড়ির নিকটে এক গ্রামে। তিনি মাঝে মাঝে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে আসতেন। তিনি এলে সকলে মিলে মজা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র এক একটা অদ্ভুত বিষয় বলে তাঁকে সেই বিষয় নিয়ে এক একটা কবিতা রচনা করতে বলতেন, কৃষ্ণধন সঙ্গে সঙ্গে তা মুখে মুখে রচনা করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিতেন। একদিন কৃষ্ণধন এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক করলেন আজ ওঁকে খুব জব্দ করবেন। এমন একটা লাইন বলবেন যা বাস্তবে অসম্ভব মনে হয়। অবশ্য কি জবাব হবে সেটা তিনি নিজে ঠিক করে রেখেছেন। প্রশ্ন হ'ল—"গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে।" বঙ্কিমের মুখে ঐ লাইনটা শুনে সকলে অবাক্। এ কি উদ্ভট কবিতা! শেয়াল কি কখনো আকাশে উঠতে পারে যে আকাশে উঠে হুয়া হুয়া করে ডাকবে? সকলে যখন এমনি বলাবলি করছেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু মৃদু মৃদু হাসছেন, আর কৃষ্ণধন মাথা হেঁট করে আপন মনে চিন্তা করছেন। একটু পরেই কৃষ্ণধন বললেন, "তা হলে শুনুন," বলেই তিনি বলে যেতে লাগলেন—যার মর্মার্থ এই: 'লক্ষ্মণ শক্তিশেলে অজ্ঞান হয়ে পড়লে চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে মহাবীর হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে বিশল্যকরণীয় পাতা আনতে গেলেন। সেখানে বিশল্যকরণীর গাছ চিনতে না পেরে শেষে গোটা গন্ধমাদন পর্বতটাকেই মাথায় করে আকাশ-পথে উড়ে আসতে লাগলেন। গন্ধমাদন পর্বতে বাঘ, ভালুক প্রভৃতি নানা রকম জীবজন্তু বাস করত। এমন কি শেয়ালও বাস করত। এখন, শেয়ালদের স্বভাব, সন্ধ্যে হলেই সবাই একসঙ্গে ডাকতে শুরু করে দেয়। বীর হনুমান মাথায় করে গন্ধমাদন আনতে আনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। অমনি সেখানকার শেয়ালরা হুয়া হুয়া করে দল বেঁধে ডাকতে লাগল। এক দম্পতি বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ আকাশে শেয়ালের হুয়া হুয়া রব শুনে স্ত্রী স্বামীকে ডেকে বলল,

"কভু শুনি নাই নাথ, ভুবন মাঝারে,
গগনেতে ডাকে শিবা হুয়া হুয়া করে!"

কৃষ্ণধনের কবিতা শুনে বঙ্কিম হাসতে হাসতে বললেন, "ঘাট হয়েছে মশাই! সত্যি আপনি অপরাজেয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীও হাসি-রসিকতায় স্বামীর উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন। তখন বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ড বের হয়েছে, সম্পাদক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। মলাটের ওপর বড় বড় অক্ষরে লেখা,

"বঙ্গদর্শন"। টেবিলের ওপর রয়েছে মাসিক 'বঙ্গদর্শনে'র কপি একখানা। কোন্ ফাঁকে এসে রাজলক্ষ্মী দেবী 'ব'র নীচে একটা শূন্য বসিয়ে রেখে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ কন্যা বাবার কাছে এসে বললে, "তুমি যে বলেছিলে এই বইটির নাম 'বঙ্গদর্শন'? এ যে 'রঙ্গদর্শন' দেখছি!"

বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "আমি তো বঙ্গদর্শনই লিখেছিলাম, তোর মার গুণে যদি তা 'রঙ্গদর্শন' হয়ে থাকে তো আমি কি করব, বল?"

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই ঠোঁটে তখন মৃদু মৃদু হাসি ছড়ানো। *

* বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ কৃষ্ণধনকে যে হেঁয়ালিটি বলেছিলেন সেটি সেকালকার আর এক বিস্মৃতপ্রায় কবির রচনা থেকে নিয়ে তাঁকে পূরণ করতে দিয়েছিলেন। সেই সেকালের কবিটির নামও কৃষ্ণ, তবে ধন নয়,—কান্ত, এবং মুখোপাধ্যায় নয়,—ভাদুড়ী। তবে তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'রসসাগর' এবং সেই নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। নদীয়ার মহারাজা গিরীশচন্দ্র তাঁর খুব গুণগ্রাহী ছিলেন এবং এ সব হেঁয়ালি নাকি মহারাজাই বেশির ভাগ লিখে রসসাগরকে পূরণ করতে বলতেন। একবার রসসাগরকে একটি লাইন পূরণ করতে দেওয়া হয়েছিল, সেটি হচ্ছে—"গগনমণ্ডলে শিবা ডাকে হোয়া হোয়া।" রসসাগরও প্রায় ঐ একই কাহিনী দিয়ে একই ভাবে কবিতাটি পূরণ করেছিলেন। এখানে সেটি সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি ঃ

"শক্তিশেলে ম্রিয়মান লক্ষ্মণের হতজ্ঞান রামাজ্ঞায় হনুমান গন্ধমাদনেতে যায়।
ঔষধ সহিত গিরি অন্তরীক্ষে শিরে ধরি নন্দীগ্রাম পরিহরি' ঊর্দ্ধপথে ধায়॥
জাগ্রত ভরত রায় শ্রীরামচরিত গায় হৃদয় ভাসিয়া যায় নেত্রজলে ধোয়া।
শত্রুঘ্ন রে, দেখ দিবা বিধির আশ্চর্য কিবা গগনমণ্ডলে শিবা ডাকে হোয়া হোয়া॥"

—রামধনু সম্পাদক

দ্বন্দ্ব

কেয়া রায়

কালো টাকা বলে, সাদা, মুখ কেন ম্লান?
এতদিন করেছিস মোরে হতমান।
স্বাধীনতা পেয়ে আজ চড়েছি মাথায়,
হেন সাধ্য নাই কারো আমাদের নামায়।
সুখের শিখরে থাকে চায় যারা মোরে,
কোন তৃপ্তি নাই তার শুধু পেলে তোরে।

সাদা বলে, ওরে কালো, গর্ব তোর মিছে,
শান্তি কভু নাহি ধায় তোর পিছে পিছে।
জগতের সেরা ধন আমারি জিম্মায়,
তোরে পেলে সুখ কি রে, ভয়ে দিন যায়!
কে যে ভালো, কে যে মন্দ, বোঝা যায় সব
হঠাৎ পড়িলে ধরা—হায় হায় রব।

আস্ত গাধা

৺বুদ্ধদেব বসু

ধুত্তোর, পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোন সুখ নেই। মানুষগুলো নামেই মানুষ—বুদ্ধিসুদ্ধি তাদের এক ফোঁটাও নেই। আরে, আমাদের মংলি তো একটা আস্ত গাধা, তার কথা আর কী বলবো? কিন্তু সুপতি তালুকদার নিজেই যে শেষ পর্যন্ত এমন একটা কাণ্ড করবেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। বাস্তবিক, এই মানুষ জাতটাই অদ্ভুত!

সুপতি তালুকদার কে তা আবার ব'লে দিতে হবে নাকি? আর কেউ নয়, সাক্ষাৎ অল্-বেঙ্গল স্পোর্টিং-এর সেণ্টার-ফরোয়ার্ড। লোকের মুখে তো এ বছর মেট্রো আর তালুকদার ছাড়া কথাই নেই। হবে না? তৈরি খেলোয়াড়!

আমি এ বছর থার্ড কেলাসে উঠেছি। আর দু' বছর বাদেই ম্যাট্রিক কেলাসে উঠব। গেল বছর প্রথম সশরীরে ফুটবলের মাঠে গেলুম, তাও ছেঁচড়ে-হেঁচড়ে—বাস্ রে, ঢুকতেই প্রাণান্ত! জামা-কাপড় ছিঁড়ে, বৃষ্টিতে টাপুটাপু ভিজে যেই বাড়িতে পা দিয়েছি, পড়বি তো পড় একেবারে বাবার খপ্পরে। বকুনি খেলুম, মনে বড় কষ্ট হ'ল। হায় রে, ছেলেমানুষ বলেই তো এই অত্যাচার! ওঁরা সব্বাই তো ফূর্তিসে খেলা দেখেন—জলেও ভেজেন, জামাও ছেঁড়েন, গলা ভেঙে জ্বরেও পড়ে থাকেন মাঝে মাঝে—তা ওঁদের তো আর বকবার কেউ নেই। তবু কি ভেবেছ আমি ভড়কে গেলুম? খবরের কাগজে খেলার খবর পড়ে আর ওঁদের মুখে শুনে শুনে কত আর হৈ-হৈ করা যায় বল? লুকিয়ে লুকিয়ে আর একদিন গিয়েছিলুম, সেদিন ছিল সেমি-ফাইনেল। সেদিন দেখলুম তালুকদারের খেলা— ওঃ, খেলা বটে!

তার পর এই এক বছরে আমি এক লাফে হঠাৎ অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছি। লোকে হঠাৎ দেখে দাদা ব'লে ভুল করে। আরে কেষ্টা, তুই এত বড় হয়ে গেলি কবে রে? হেঁ-হেঁ, বুঝি চিরকাল ছোটই থাকব! এখন আর আমার কোন ভাবনা নেই। এ বছর আমি প্রায়ই তো খেলা দেখতে যাই। লুকোছাপা করি না, বুক ফুলিয়ে সোজাসুজি যাই। টিকিট কিনে মারামারি হৈ-হৈ ক'রে গ্যালারির জায়গা দখল করি। ভেবেছ কি—এখন বড় হয়েছি না?

মংলিটার ক্যাবদানি কম নয়, ও-ও আসে খেলা দেখতে। ও আমার সঙ্গে একই কেলাসে পড়ে বটে, কিন্তু দেখতে ও এই একরত্তি, মনে হয় ফুঁ দিলে উড়ে যাবে। ঐটুকু মানুষ তুই, তোর আবার খেলা দেখতে আসা কেন রে বাপু! চুপচাপ বাড়ি বসে থাকবি, হেলে-দুলে লতা শব্দের রূপ মুখস্থ করবি, বড় জোর খবরের কাগজে খেলার রিপোর্ট প'ড়ে হাত-পা ছুঁড়বি। তোর মত বাচ্চাদের জন্যই তো খবরের কাগজে সব কথা লেখে!

তা অত সুবুদ্ধি কি আর মংলির? রোজ ও যাবে খেলা দেখতে। কী ক'রে ঢোকে, কী ক'রে বেরোয়, কী ক'রেই বা প্রাণ নিয়ে ঘরে ফেরে কালী-মাই জানেন। আমি হয়তো অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে ভিতরে ঢুকে সবে গ্যাঁট হ'য়ে বসেছি, পাশে থেকে একটা আওয়াজ এলো: 'এই যে কেষ্ট!'

তাকিয়ে দেখি আর কেউ নয়, মংলি। আমার মাথার উপরে বসে ফ্যা-ফ্যা ক'রে ইষ্টুপিটের মত হাসছে।

'তুই কখন্ এলি?'

'এই তো এইমাত্র।'

বাবু যেন আদ্দির জামা চড়িয়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন এমনি ওর মুখের চেহারা। রাগে শরীরটা জ্বলে যায়। মুখের ঘাম মুছে, সোজা মুখ ফিরিয়ে থাকি, তা ঐ হাবাটাই গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে আসে।

মংলিটা একটা জংলি। এতদিন তো জলপাইগুড়ির শহরে কেটেছে, এই তো সেদিন কলকেতায় এসে আমাদের ইস্কুলে ভর্তি হ'ল। পাড়াগেঁয়ে ভূত, নাকে দড়ি বেঁধে সাত পাক ঘুরিয়ে আনতে পারি—ওর আবার অত কায়দা কিসের?

সেদিন হয়েছে কি, খেলা আরম্ভ হবার আধঘণ্টা তখনো দেরি, মংলি আর আমি পাশাপাশি ব'সে মুড়মুড় ক'রে চীনেবাদাম ভেঙে ভেঙে খাচ্ছি। সেদিন অল্-বেঙ্গলের খেলা, উল্টোদিকে জাঁদরেল গোরা পল্টন টীম।

আমি বললুম, 'বল্ তো কোন্ দল জিতবে?'

মংলি বললে, 'কী জানি ভাই, কেমন ক'রে বল্‌ব?'

'আমি বল্‌তে পারি। অল্-বেঙ্গল জিতবে। তালুকদারের দৌড়খানা দেখেছিস তো? ওর জন্যেই জিতবে।' তার পর ঠোঁট বাঁকিয়ে বললাম, 'অমন খেলোয়াড় আছে তোদের জলপাইগুড়িতে?'

মংলি কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'না ভাই, নেই।' আহা—কথার কী ছিরি! ধ'রে মারতে ইচ্ছে করে। সত্যি-সত্যি যেন জিজ্ঞেস করেছি জলপাইগুড়িতে ও রকম খেলোয়াড় আছে কি নেই!

আমি বললুম, 'কী শুট! বাপ্‌স্! কেমন ম্যাজিকের মত পাস্ করে! দেখেছিস কখনো ও রকম?'

'এই তো দেখছি ভাই!'

তার পর আমি বললুম 'জানিস, সুপতি তালুকদার আমার দাদার বন্ধু?'

মংলি তৎক্ষণাৎ বললে, 'তাই নাকি?' মস্ত গোল গোল হ'য়ে উঠলো ওর চোখ দু'টো।

'প্রায়ই তো আসেন আমাদের বাড়িতে।'

আহা—অমন দু' একটা কথা বুঝি লোকে আর মাঝে মাঝে বলে না? তুমিও বল, আমিও বলি, সকলেই বলে। তার জন্য কি আর জিভ খ'সে পড়ে, না ম'রে যাবার পর টগ্‌বগে তেলে ভাজে? কচু হয়।

মংলি খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'সত্যি, তোকে হিংসে হচ্ছে ভাই!'

হবে না! হিংসে না হয়ে উপায় আছে? তার পর সেদিনকার খেলায় অল্-বেঙ্গল তো দু' গোলে জিতলো। আমি বললুম, 'দেখলি তো? সুপতি বাবু আগেই বলেছিলেন।'

'খেলায় কি হবে আগে থেকে কি কেউ বলতে পারে ?'

'পারে না ! যাকে নিয়ে সমস্ত খেলা সে পারে না ! সুপতি তালুকদার পারে না।'

মংলি ঘাবড়ে গিয়ে চুপ ক'রে গেল।

মংলিটা একটা আস্ত গাধা, ওর কাছে যা খুশি তাই বললেই হ'ল। সেদিন তো ও-সমস্ত কথা হ'ল, কয়েকদিন পর ইস্কুলের টিফিনে আমিই ওকে পাকড়াও ক'রে বললুম, 'আজ তো মস্ত খেলা, —যাবি নে ?'

'হ্যাঁ, যাবো।'

'ওঃ, এবার বুঝি অল্-বেঙ্গলই লীগ নিয়ে নেয় ! তা হ'লে কী কাণ্ড হয় বল্ তো !'

'হ্যাঁ, ভালোই তো।'

দেখতে পারি নে এই হাবাকান্তদের—সাত চড় মারলেও মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোয় না। একটু পরে বললুম, 'সুপতি তালুকদার কাল আমাদের বাড়িতে চা খেতে এসেছিলেন।'

বলো দেখি, অমন সুযোগ পেলে তোমরাই কি ও রকম কথা না বলতে ? কে না বলতো ? বলতো না শুধু মংলিদের মত ঐ আস্ত গাধারা।

শুনে মাছের মত মুখ ক'রে মংলি বললে, 'অ্যাঁ !'

'ওঃ ! কত গল্প করলেন ! ফুটবলের মারপ্যাঁচ এবারে সব বুঝে নিয়েছি। বলবো তোকে আর এক সময়।'

ব'লে আমি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চ'লে গেলুম। মংলির মুখ দেখে মনে হ'ল ওর অ্যাঁ বুঝি শীগ্‌গিরই ভ্যাঁ হয়ে যাবে।

এর পর প্রায়ই মংলির কাছে আমি সুপতি তালুকদারের গল্প করতে থাকলুম। গল্প করতে গ্র্যাণ্ড লাগে। একদিন বললুম, 'বুঝলি, আমার সঙ্গে ওঁর রীতিমত ভাব হ'য়ে গেছে, কাল আমাকে মেট্রোতে নিয়ে গেছলেন।' তার পর থেকে আমার মুখে উনি সুপতি-দা হয়ে গেলেন। 'খেলার সীজ্‌ন্‌টা শেষ হ'লেই সুপতি-দা দারজিলিঙ্ চ'লে যাবেন।' 'সন্দেশ আর কলা খেতে সুপতি-দা সব চেয়ে ভালোবাসেন।' 'সুপতি-দার তিনবার পা ভেঙেছে—এখন এমন হয়েছে যে ভাঙলেও কিছু হবে না।' 'সুপতি-দা সামনের বছর বিলেত যাচ্ছেন ব্যারিস্‌টরি পড়তে।' এমনি কত কথাই যে বলতুম তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে, নাকি আমারই মনে আছে ? একদিন শ্রীপতি-দার বাড়িতে নেমন্তন্নও খেয়ে এলুম ; চুপি-চুপি তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ধমক খেলুম অঙ্কের হরগোবিন্দ বাবুর কাছে।

মংলিটা ক্যাব্‌লাকান্ত, সব চুপ ক'রে শোনে—শুন্‌তে শুন্‌তে হাঁ-টা মস্ত হ'য়ে ওঠে। শেষটায় একদিন আর থাকতে না পেরে বললে : 'দিবি ভাই, আমার সঙ্গে একটু আলাপ করিয়ে ?'

আমি দু'টো তুড়ি দিয়ে বললুম : 'ওঃ, তা দেবো'খন। শোন্, আমি এবার থেকে ফুটবল খেলা ধরবো।'

মংলি বললে : 'তা বেশ তো। ইস্কুলের টীমে—'

'ছোঃ! ইস্কুলের টীমে খেলবো কী রে পাগ্‌লা! সুপতি-দা আমাকে প্রাইভেট লেসন্স দিচ্ছেন —বলেছেন একবারেই আমি এ-ডিভিসনের কোন টীমে নামতে পারবো।'

মংলিটা আবার বললে: 'তোর সুপতি-দা আবার তোদের বাড়িতে এলে একটু খবর দিস্ ভাই, একটা অটোগ্রাফের সই নিয়ে আসবো।'

ভালো লাগে না এই ঘ্যান্‌ঘ্যানানি। চেঁচিয়ে ডাকলুম: 'এই প্রসন্ন, শোন্, তোর সঙ্গে কথা আছে।' বলতে বলতে চ'লে গেলুম প্রসন্নর দিকে।

তার পর এক শনিবার মংলি বললে: 'কাল ভাই আমাদের বাড়িতে তোর নেমন্তন্ন।'

আমি খুব ফূর্ত্তি ক'রে বললুম: 'হঠাৎ কেন রে? ব্যাপার কী?'

'দিদি ব'লে দিয়েছেন?'

'তোর আবার দিদি আছে নাকি একজন?'

'দিদি এত দিন গিরিডিতে ছিলেন কিনা, এই তো সেদিন মোটে ফিরলেন। তিনি আমার বন্ধুদের খাওয়াবেন কাল। প্রসন্ন, রমেশ আর অবিনাশকেও বলেছি।'

তা বেশ কথা। খাওয়া যাবে সকলে মিলে হৈ চৈ ক'রে। মংলিটা তো একটা মিনমিনে ভূত —খালি ওর সঙ্গে কি কোন ফূর্ত্তি জমে!

পরদিন তো বেলা এগারোটা নাগাদ চান-টান ক'রে মিহি ধুতি পরেছি আর সিল্কের পাঞ্জাবি আর চক্‌চকে কালো পম্প-শু—সাজখানা জমকালোই বলতে হবে। তা ছাড়া বৌদির হেজলিন স্নো আর পাউডার মেখে—বলতে লজ্জা করে, কিন্তু সত্যি বলছি, আমাকে ভালোই দেখাচ্ছিলো খুব। গিয়ে দেখি, মংলি নীচের তলার ঘরে একলা ব'সে আছে। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'চল্ ভাই উপরে, ওরা সব এসে গেছে।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই খুব হো-হো হাসির শব্দ শোনা গেল। বাঃ, আমাকে ফেলেই ওরা তো জমিয়েছে বেশ! নিশ্চয়ই ঐ জবড়জং রমেশটা। ওর ফোঁপর-দালালি আমি মোটেই সইতে পারি নে।

মংলি বললে, 'এই যে, এই ঘরে।'

মুখ-চোখের খুব একটা স্মার্ট ভাব ক'রে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। কিন্তু ঢুকেই আমার মনে হ'ল চোখের সামনে ভালো ক'রে কিছু দেখতে পাচ্ছি নে, ঘরের মেঝেটা যেন একটু একটু টলছে।

মংলির গলার আওয়াজ শুনলুম, 'এই তো দিদি, আর এই আমার জামাই বাবু। জামাই বাবু, কেষ্ট আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে খুন।'

সুপতি তালুকদার বললেন,—'খুব বুঝি খেলা দেখো? বেশ, বেশ।'

ওঃ, খাওয়ার কত যে ভালো ভালো জিনিস ছিল সে কী বলবো! চোখেই দেখলুম, খেতে যেন ভুলেই গেছি। ধুত্তোর, খাওয়া না ছাই। মংলি একটা আস্ত গাধা সে তো সকলেই জানে, কিন্তু শেষটায় সুপতি তালুকদারও—! তাঁর কী দরকার ছিল এক্কেবারে ঐ মংলিটার জামাই বাবু হবার? বলো তো? নাঃ, পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোন সুখ নেই। ইচ্ছে মত দু'টো কথাও বলা যায় না।

(সাতচল্লিশ বছর আগেকার রামধনু থেকে)

কইরু কোলের কথা

৺বিজয়চন্দ্র মজুমদার

এক যে ছিল কইরু মুণ্ডা—জাতিতে কোল। গায়ের রঙ ছিল কুচ্‌কুচে কালো, শরীর ছিল বলিষ্ঠ। তীর-ধনুক নিয়া শিকার করিতে ছিল খুব ওস্তাদ, আর যখনকার কথা বলিতেছি তখন তাহার বয়স ছিল কুড়ি। কইরুর কথা শুনাইবার আগে তাহার দেশের একটুখানি পরিচয় দিতেছি।

বাংলা দেশের পশ্চিমে যে বন-পাহাড়ের মুল্লুকের নাম ছোটনাগপুর, সেই মুল্লুকের দক্ষিণ দিকে ছিল কইরুদের বসতি। পাহাড়িয়া ও বুনা কোল জাতির একটা সম্প্রদায়ের নাম "চুটিয়া"; এই চুটিয়া সম্প্রদায়ের কোলেরা এক সময়ে খুব ক্ষমতাশালী ছিল, আর সেই চুটিয়াদের নামে সেই অঞ্চলটার নাম হইয়াছিল চুটিয়া নাগপুর। লোকে এখন বলে ছোটনাগপুর। কোলেদের গায়ের রঙ কালো, থাকে বনে পাহাড়ে; কিন্তু ঐ জাতির লোকেরা বড়ই সাহসী, সত্যবাদী ও প্রফুল্ল। উহারা হিঁদুদের ছোঁয়া জলটুকুও খায় না, তা সে জলটুকু ব্রাহ্মণই দিন আর যিনিই দিন।

ছোটনাগপুরের দক্ষিণ অঞ্চলের কাছাকাছি অনেকগুলি কোলেদের গ্রাম, আর তাহার মধ্যে আমরা বলিব দুইখানি গ্রামের কথা। কইরু মুণ্ডার গ্রামের নাম 'উলিকেরা' আর তাহার পাশের অন্য একখানি গ্রামের নাম 'দিরিকেরা'। দিরিকেরা গ্রামের যে বড় চাষী, অর্থাৎ মুণ্ডা, তাহার মেয়ের নাম ছিল জুল্‌কি; আর গল্পের সময় সেই মেয়ের বয়স ছিল পনেরো। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই, কেন না কোলেদের মধ্যে ছেলে-মেয়েরা বড় হইয়া নিজেদের পছন্দমত বিবাহ করে।

একদিন জুল্‌কি খেলা করিতে করিতে ও গান গাহিতে গাহিতে একা একটা পাহাড়ের মাথায় চড়িয়া চারিদিকের বনজঙ্গল দেখিতেছিল। গ্রামের লোকেরা তখন পাহাড়ের তলায় একটা চটাঙ্গ-এর উপরে বসিয়া গল্পসল্প করিতেছিল, আর কয়েকজন ছেলে-মেয়ে খেলার ছলে জুল্‌কির দিকে তাকাইয়া তাহাকে চেঁচাইয়া ডাকিতেছিল।

জুল্‌কি সহসা একটা কুলা বা বাঘ দেখিতে পাইয়াছে বলিয়া চেঁচাইল। সেদিন কইরু আসিয়াছিল দিরিকেরায় বেড়াইতে, আর তাহার যেমন অভ্যাস সেই রকম তাহার তীর-ধনুক সঙ্গে আনিয়াছিল। মেয়েটির চেঁচানি শুনিয়া সবল পুরুষেরা গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল, আর বাঘ কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। জুল্‌কি খুব খুঁটাইয়া

খুঁটাইয়া বুঝাইয়া দিল যে পাহাড়ের পশ্চিমের দিকের ঝর্ণায় মহুয়া গাছের তলায় বাঘ জল খাইতেছে। সকলেরই পথঘাট চেনা ছিল; কইরু ও আর জনকতক জোয়ান ছেলে তীর-ধনুক ও "টাঙ্গিয়া" হাতে নিয়া ছুটিল। জুল্‌কি পাহাড় হইতে নামিল না, বাঘের দিকে তাকাইয়া রহিল।

ঝর্ণার দিকে গিয়া শিকারী কোলের দল কি রকমে কোথায় বড় বড় পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়া তাক্ করিয়া শর ছুঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল, জুল্‌কি তাহা দেখিতে পায় নাই। বাঘটা জল খাইয়া গভীর বনের দিকে যখন ধীরে ধীরে চলিতেছিল, তখন জুল্‌কি দেখিল বাঘের গায়ে একটা শর বিঁধিয়াছে, আর বাঘটা গাঁ-গাঁ আওয়াজ করিয়া ঝর্ণার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছে। শরের পর শর বাঘের গায়ে বিঁধিল, আর বাঘটা লাফাইয়া ঝর্ণার কূলে আসিয়া পড়িয়া গেল। জুল্‌কি তখন দেখিল যে কইরু ও তাহার সঙ্গীরা ছুটিয়া বাঘের দিকে চলিতেছে।

কয়েকটি কোল যুবক কাজে ব্যস্ত

বাঘ মরিল, আর কোল শিকারীরা তাহাদের টাঙ্গিয়া বা কুড়াল দিয়া কয়েকটা লতা কাটিল, আর সেই লতা দিয়া বাঘটাকে বাঁধিয়া, তাহাদের শরগুলি গুছাইয়া নিয়া, বাঘটিকে বহিয়া গ্রামের দিকে চলিল। জুল্‌কি আনন্দে লাফাইয়া লাফাইয়া যখন পাহাড় হইতে নামিল, শিকারীরা তখন বাঘ বহিয়া ফিরিল, আর গ্রামের লোকেরা বাঘকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কোলেদের মধ্যে এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে সংবাদ পৌঁছাইবার আশ্চর্য সঙ্কেত আছে। দেখিতে দেখিতে কইরুর উলিকেরা গ্রামের ও অন্য গ্রামের অনেক স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া জুটিল। বাঘ ছিল খুব বড়, তাহার মাংস হইল ঢের; তিন গ্রামের লোকেরা মাংস ভাগ করিয়া নিল। কোলেরা বাঘের মাংস খায়।

যখন মাংসের জন্য বাঘ কাটা হইতেছিল তখন দিরিকেরার চিম্নু শিকারী বলিল যে বাঘের জিভটা পাইবে কইরু। বাঘের জিভে ওষুধ হয় বলিয়া উহার অনেক মূল্য। কইরু সে কথা শুনিয়া বলিল, বাঘের জিভ পাইবে জুল্‌কি, কেননা সেই-ই বাঘ দেখিয়াছিল। জুল্‌কি বলিল, না না, জিভ পাইবে শিকারীরা। তখন জুল্‌কির এক সহচরী হাসিয়া বলিল যে জিভটি কইরু পাইলেও জুল্‌কির হইবে, জুল্‌কি পাইলেও কইরুর হইবে। কারণ, সে জানে যে কইরু জুল্‌কিকে বিবাহ করিতে চায়। সকলে কইরু ও জুল্‌কির দিকে তাকাইল। কইরু কথা কহিল না — মাংস কাটিতে লাগিল, আর জুল্‌কি সহাস্য মুখে মাটির দিকে তাকাইল।

সেখানে জুল্‌কির মা-বাপ ছিল। কইরুর বাপ, মা, ভাইবোনেরাও আসিয়াছিল। সকলেই বুঝিল কথাটা ঠিক। জুল্‌কির বাপ তখন বলিল যে আজ, এই শিকারের দিনে, তিন গ্রামের লোকের সাক্ষাতে তবে কইরু ও জুল্‌কির বিবাহের দিন স্থির হউক। কোলেদের বিবাহ হয় মাঘ মাসে, আর সেই মাঘ মাস হইবার অল্পই দিনকতক বাকি ছিল।

কথা ঠিক হইয়া গেল; তখন স্থির হইল যে সকলেই রাত্রে দিরিকেরায় খাইবে ও নাচ-গান করিবে। রাত্রে সকল ছেলে-মেয়েরা জুটিয়া নাচিল, গাহিল ও মাদল বাজাইল, আর সেই নাচের দলে কোলেদের নিয়ম অনুসারে কইরু এবং জুল্‌কিও নাচিতে লাগিল। মাঘ মাসে যে দিন বিবাহ হইয়াছিল, সেদিনও হইয়াছিল এই রকমের খাওয়াদাওয়া আর নাচগান। কোলেদের বিবাহে পুরোহিত চাই না; মন্ত্র পড়ারও প্রয়োজন নাই। এই রকমের আনন্দ-উৎসব হইলেই বিবাহ শেষ হয়।

(১ম বর্ষের রামধনু থেকে)

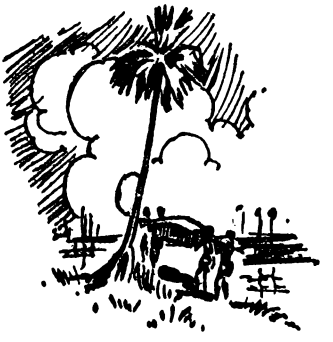

রাক্ষুসী

(উপন্যাস)

শ্রীমেঘনাদ

দুই

প্রজেশ্বর সিংহ কতকগুলি বিদেশী ভাষা শিখছিলেন। সেই উপলক্ষে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন তিনি—ঐ ভাষা শিক্ষার জন্যই। কয়েকটা বিদেশী রাষ্ট্রের এম্‌ব্যাসী থেকে এই ভাষা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল। শেখাতেন ঐ সব দেশেরই লোকেরা। তাঁরা সকলেই যে বুড়ো মাষ্টার মশাইদের মত বয়স্ক ব্যক্তি হতেন এমন নয়। অল্পবয়সী সাহেব-মেমরাও এ রকম ক্লাস নিতেন। এঁরা অনেকে প্রজেশ্বর সিংহের সমবয়সী, তাই সহজেই তাঁদের কারো কারো সঙ্গে প্রজেশ্বর বাবুর বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, এমন কি বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল। এঁদেরই মধ্যে একজন ছিলেন ডেনি আলফানসো। বয়সে প্রায় প্রজেশ্বর বাবুরই সমবয়সী, পোর্তুগালের লোক।

আলফানসোর পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ নাকি শ'তিনেক বছর আগে ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন, তাই আলফানসোর এদেশের সম্বন্ধে একটু কৌতূহল ছিল এবং হয়তো তারই জন্য, তিনি এখানে চাকরি নিয়ে চলে আসেন। না, সেই পূর্বপুরুষ বোম্বেটে দস্যুদের সঙ্গে তাঁর কোন মিল নেই। বেশ শিক্ষিত, মিষ্টভাষী যুবক। ইতিমধ্যেই বেশ একটু বাংলাও শিখে নিয়েছেন তিনি।

প্রজেশ্বর বাবু কলকাতায় এলেই আলফানসোর সঙ্গে দেখা করতেন। একবার আলফানসোকে তিনি বউপোতায় যাবার জন্য নেমন্তন্নও করেছিলেন; কিন্তু ওঁদের চাকরির কি সব বাধা আছে বলে আলফানসোর আর সেখানে যাওয়া হয় নি। তা না হোক, দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ হামেশাই হ'ত আর, বলতে কি, দেখতে দেখতে বন্ধুত্বটাও দু'জনের মধ্যে বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছিল।

এরই মধ্যে আলফানসো হঠাৎ একটা লোভনীয় প্রস্তাব করে বসলেন। তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য ছুটী পেয়েছেন। না, ছুটী কাটাতে দেশে যাবেন না,—যাবেন একটু বেড়াতে এবং সে জায়গাটা হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকার ব্রেজিলের একটি নিভৃত পল্লী। সেখানে ওঁর কিছু নিকট-আত্মীয় থাকেন, তাঁরা বার বার যাবার জন্য লিখছেন। প্রজেশ্বর বাবুরও তো দেশভ্রমণের শখ আছে, চলুন না ওঁর সঙ্গে সপ্তাহ দু'য়েকের জন্য। পয়সার তো অভাব নেই ওঁর। আর কতই বা খরচ হবে? ভ্রমণের আনন্দের তুলনায় এমন কিছুই নয়। তা ছাড়া ওখানে থাকার ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা আলফানসোই করে দেবেন।

প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নেই। এক সমস্যা,—চঞ্চল। তা এ ক'টা দিন তার ভার নেবার জন্য বিশ্বস্ত লোক তাঁর বাড়িতেই আছে। ফকিরচাঁদ তাঁর বাবার আমলের লোক, খুব বিশ্বাসী। সে-ই এ ক'টা দিনের জন্য চঞ্চলের ভার নিতে পারবে।

শেষ পর্যন্ত প্রজেশ্বর বাবু আলফানসোর প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

রিও-ডি-জেনেরো থেকে আন্দাজ পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের নীচে একটি গ্রাম। সেখানেই থাকেন আলফানসোর আত্মীয়েরা। প্রজেশ্বর বাবুকে নিয়ে আলফানসো সেখানেই গিয়ে তুললেন। অত্যন্ত অমায়িক এবং ভদ্র এই আত্মীয়েরা। এখানকার লোকেরা পোর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে।

প্রজেশ্বর বাবু আগেই পোর্তুগীজ ভাষা চলনসই রকম বলতে পারতেন, এখানে আসবার পর তাতে আরও দক্ষ হয়ে উঠলেন। বাড়ির লোকেরাও তাঁকে কয়েক দিনের মধ্যেই আপনার করে নিলেন। এমন কি প্রজেশ্বর বাবুকে সামান্য কোন খরচও তাঁরা করতে দিতেন না, বলতেন, আপনি আমাদের অতিথি, ভারতীয়দের মত আমাদেরকেও আতিথ্যের পুণ্যার্জনের সুযোগ দিন। আপনাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বহুদিনের। তা ছাড়া আপনাদের দেশের কর্নেল বিশ্বাস তো এখানেই এসে আমাদের সমাজে বিয়ে-থা করে এখানেই সংসার পেতে গেছেন। তাঁর বংশধররা তো এখন পুরোপুরি ব্রেজিলিয়ান!

প্রজেশ্বর বাবু এমনটা আশা করেন নি। দু'দিনের মধ্যেই তিনি ওঁদের সঙ্গে দিব্যি মিশে গেলেন।

আলফানসোর ওটা ছিল মাসির বাড়ি। বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার। বাড়িতে লোক বলতে জনা পাঁচেক। মাসি, মেসো, তাঁর দুই ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে একজন নেহাৎই বালক, অপর জন আলফানসোর চাইতে অল্প কিছু ছোট। বোনটিও তিনের কোঠায় পা দিয়েছে, এখনও তার বিয়ে হয় নি। নাম হিল্ডা।

হিল্ডা দেখতে বেশ সুন্দরী, স্বভাবটিও ভারি মিষ্টি। ভারত সম্বন্ধে তার আগ্রহ, কেন জানি না, খুব বেশি। বইটই পড়ে সে অনেক কিছু জেনেও নিয়েছে ঐ দেশ সম্বন্ধে; তবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু নেই। প্রজেশ্বর বাবুকে পেয়ে সে তার অনেক দিনের নানা কৌতূহল মেটাবার সুযোগ পেয়ে গেল।

দেখতে দেখতে দু' সপ্তাহ পার হয়ে গেল। আলফানসোর ফিরবার সময় হয়ে এল। ছুটী ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু তাঁর মাসির বাড়ির লোকেরা প্রজেশ্বর বাবুকে অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে চাইলেন না—আটকে রাখলেন। ফলে আলফানসো চলে এলেও প্রজেশ্বর বাবু আরও কিছুদিন রয়ে গেলেন ঐ পরিবারের সঙ্গেই।

কারণটা অল্পদিন পরেই বোঝা গেল! হিল্ডাকে তাঁর খুব ভালো লেগেছে, হিল্ডাও তাঁকে খুব পছন্দ করেছে। দু'জনের কেউই এতদিন বিয়ে করেন নি। তবে কি ওঁরা পরস্পরকে বিয়ে করার কথা ভাবছেন?

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এ রকম ইণ্টারন্যাশনাল অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বিয়ে তো কতই ঘটছে আজকাল! আর প্রজেশ্বর বাবু তো নিজেই নিজের কর্তা, কারো অনুমতিটতি নেবার প্রশ্নই ওঠে না। এক মাস যেতে না যেতেই দেখা গেল হিল্ডা আর ব্রেজিলিয়ান বংশের কেউ ন'ন, তিনি এখন পুরোপুরি বাঙ্গালী পরিবারের বধূ—মিসেস সিংহ।

অল্পদিন পরেই স্ত্রীকে নিয়ে প্রজেশ্বর বাবু বউপোঁতায় ফিরে এলেন। হিল্ডার মা মেয়ের সঙ্গে তাঁদের একটি পরিচারিকাকেও দিয়ে দিলেন। তার নাম মার্থা। বয়সে সে প্রায় হিল্ডারই বয়সী। তাই ব্যবহারও তার অনেকটা সখীর মত। আলফানসোও এই খবর শুনে খুব খুশি।

হিল্ডা বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যেতে লাগলেন। শিখতে লাগলেন বাংলা ভাষা, এবং অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় কথাও বলতে আরম্ভ করলেন।

বছর খানেক পরে তাঁদের একটি ছেলেও হ'ল। হিল্ডাই আদর করে তার নাম রাখলেন স্বামীর পরিবারের সঙ্গে নাম মিলিয়ে—দেবেশ্বর। আর, বাঙ্গালীদের মতই তাকে ডাকতে লাগলেন খোকন বলে। দেখতে দেখতে খোকন প্রায় এক বছরেরটি হয়ে উঠল।

প্রজেশ্বর বাবু নিজের ছেলেকে খুব ভালবাসলেও চঞ্চলের প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা কিন্তু একটুও কমল না। চঞ্চলও আগের মতই তাঁর নেওটা হয়ে রইল। প্রজেশ্বর বাবুকে সত্যিই সে নিজের বাবার মত ভালবাসত। তাঁর স্নেহের নতুন একজন ভাগীদার এলেও সে যে খুব বিচলিত হয়েছে এমন মনে হ'ল না। কিন্তু হিল্ডা? না হিল্ডাকে বোধ হয় তার মোটেই পছন্দ হয় নি। বেশ তো ছিল তারা। নিশ্চিন্ত পরিবার। তাদের সেই নিশ্চিন্ত পরিবারে হঠাৎ কে এই বিদেশিনী উড়ে এসে যুড়ে বসল? (ক্রমশ)

স্বপ্নলোকের চাবি

সুরজিত রায়

সকালবেলা পাখির ডাকে
ঘুমটি ভেঙ্গে যায়,
তাকিয়ে দেখি সুয্যি মামা
মিটির মিটির চায়।

চারিদিকে রঙের আভাস—
নতুন দিনের আলো,
কোন্ যাদুকর মুছে দিল
আকাশ-যোড়া কালো!

ঘাসের ডগায় শিশির ঝলে—
বাড়তে থাকে বেলা,
রাঙা আলোর পাই না দেখা—
তপ্ত রোদের খেলা।

গড়িয়ে চলে তাতানো রোদ,
দূরে ঘণ্টা বাজে;
স্বপ্ন ভাঙ্গে, জড়িয়ে পড়ি
ঘাম-ঝরানো কাজে।

হঠাৎ আবার আকাশ রাঙা,
তখন মনে ভাবি
দিন ফুরাল, পাব আবার
স্বপ্নলোকের চাবি।

শুকতারা

বকুল কানুনগো

শুকতারা অপলক
ভোর আকাশে,
আমি চেয়ে থাকি, চোখে
ঘুম মাখা সে।
দৃষ্টির আড়ালে ও
কোথায় ছিল,
সারারাত জেগে জেগে
পাহারা দিল?
একটু পরেই বুঝি
ক্লান্তিতে ফের
ও যাবে ঘুমোতে চলে
আড়ালে রোদের।
সন্ধ্যার দীপ জেলে,
আঁধার টুটে
ঝিলমিল ঝিলমিল
উঠবে ফুটে।

বিষয় 'ব'

বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়

বনগাঁর বলাই বাবুর বলিয়ে বলে বড্ড বড়াই। বোলচালে বাড়ির বাসিন্দারা বিলকুল ব্যতিব্যস্ত। বাড়ির বয়স্করা বলেন, বলিয়ের বদলে বাক্যবীর বল। বাড়ির বাইরে বেরুলেই বুঝব বক্তৃতার বাহার।

বলাই বাবু বেজায় ব্যস্ত। বলেন, বেশ, বাইরেই বলব; বহুবার বলেছি।

ম্যাজিকের আসর

(৭০ পৃষ্ঠার পরে)

করে ধার। এই চারটে ধারের মধ্যে সত্য ছেঁড়া ধারটি হবে খসখসে। অর্থাৎ প্রথম এবং তৃতীয় টুকরোটির ভিতরের দিকের কেবল মাত্র একটি ধার খসখসে হবে, কিন্তু মাঝখানের বা দ্বিতীয় টুকরোটির দু'টো ধারই হবে খসখসে,—যা হাত দিয়ে অনুভব করা যায়, দেখলে তো বোঝা যায়ই।

তুমি যখন প্রথমবার কাগজগুলো দর্শকদের হাতে দেবে তখন লক্ষ রাখবে কার কার কাছে একটি ধার খসখসে কাগজ গেছে। তাঁদেরকে তাঁদের কাগজে একজন করে বিখ্যাত জীবিত ব্যক্তির নাম লিখতে বলবে, আর যে কাগজটির দু'ধারই খসখসে তাতে একজন বিখ্যাত মৃত ব্যক্তির নাম লিখতে বলবে। এরপর কাগজগুলো ভাঁজ করে মিশিয়ে দিলে তুমি টুপি বা পাত্রের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ভাঁজ খুললেই বুঝে নিতে পারবে কোনটির একধার খসখসে এবং কোনটির দু'ধার খসখসে। অর্থাৎ কোন্‌টিতে জীবিত ব্যক্তির নাম লেখা, কোন্‌টিতে মৃত ব্যক্তির।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা নাটকটি বিশ্বসাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। নাটকটির নাম কিন্তু ঠিক শকুন্তলা নয়—'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। সংস্কৃতে লেখা তো, তবে কথাবার্তার মধ্যে প্রাকৃত ভাষাও আছে। মহাভারতের শকুন্তলা-দুষ্মন্তের উপাখ্যান অবলম্বন করে লেখা হলেও কালিদাস কিন্তু ওতে নিজস্ব অনেক কিছু ঢুকিয়ে দিয়েছেন। দুর্বাসার অভিশাপ, আংটি হারানো এবং সেই জন্যই দুষ্মন্তের শকুন্তলাকে চিনতে না পারা এবং শেষে মাছের পেটে আংটি পেয়ে দুষ্মন্তের পূর্বকথা মনে পড়ে যাওয়া—এ সবই কালিদাসের বানানো, হয়তো দুষ্মন্তকে খানিকটা নির্দোষ দেখাবার জন্যই। আসল মহাভারতে কিন্তু ও-সব নেই। যাই হোক, কালিদাসের শকুন্তলা যে এখনও কি রকম জনপ্রিয় তা বোঝা যায় যখন দেখি প্রায়ই ইয়োরোপের নানা দেশে, বিশেষ করে জার্মানী ও রাশিয়ায় সে দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ঐ বই নিজেদের ভাষায় তরজমা করে অভিনয় করছেন। সম্প্রতি চীনেও ঐ বইটি অভিনয় করা হচ্ছে এবং সেখানকার লোকেরাও নাটকটি খুব পছন্দ করছেন।

কালিদাসের আমলেও ও বই অভিনীত হ'ত। তখনকার দিনেও এদেশে ভালো রঙ্গালয় ছিল। নাটকের গোড়াতেই সূত্রধার এসে নাট্যের দেবতা জর্জর দেবের পূজো করতেন—মঞ্চ বা স্টেজের ওপরেই। তাঁকে প্রসন্ন করে সূত্রধার নান্দী পাঠ করতেন। নান্দীপাঠ মানে দেবতা প্রভৃতির স্তুতি। নান্দীপাঠ হয়ে গেলে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা স্টেজে নামতেন এবং তার পরই শুরু হ'ত নাটকের অভিনয়।

বুল ফ্রগের নাম শুনেছ?

ফ্রগ্ হচ্ছে ব্যাঙ; বুল্ ফ্রগ্ হচ্ছে এক জাতের অতিকায় ব্যাঙ,—যারা সুযোগ পেলে মাছ, ইঁদুর, পাখি ধরেও খায়। একবার এদের একটাকে একটা আস্ত বড় বাদুড় ধরেও খেতে দেখা গিয়েছিল। কোন কোন বুল্ ফ্রগ্ আকারে একটা হুলো বেড়ালের চেয়েও বড়।

সাপ ব্যাঙ খায় বলে আমরা জানি। আবার সাপ কিন্তু বুল্ ফ্রগেরও একটি প্রিয় খাদ্য। অবশ্য বিষধর সাপ খাওয়া বোধ হয় সহজ নয়, তার জন্য দস্তুরমত সাহস ও কৌশল দরকার।

তবে বুল্ ফ্রগ্ পোকামাকড় খেতে খুব ভালবাসে। যে সব ক্ষেতে পোকামাকড়ের উৎপাত বেশি, সেখানে বুল্ ফ্রগ্ ছেড়ে দিয়ে দেখা গেছে ওরা পোকামাকড় খেয়ে এমন ভাবে ক্ষেত সাফ করে দিচ্ছে যে ওদেরকে চাষীর বন্ধু বললেও ভুল হবে না।

এ জাতের ব্যাঙ কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় না। এরা অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার বাসিন্দা।

বর্ষা

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

[গ্রীষ্মের শেষে কোথা থেকে মেঘ উড়ে এসে তপ্ত ধরণীকে শীতল বারিধারায় স্নান করিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু অবিশ্রান্ত বর্ষণ,—ঝরছে তো ঝরছেই। এ যেন ধ্যানরত শিবের চোখের আগুনে মদনভস্মের পর তার স্ত্রী রতির সেই কান্না। থামতেই চায় না।]

পাগল-করা বৃষ্টি ওরে, পাগল-করা বৃষ্টি !
দগ্ধ ধরার তপ্ত দুপুর করলো সজল মিষ্টি।
জ্যৈষ্ঠ মাসের তীব্র দহন
করলো যখন বহ্নি বহন,
আষাঢ়-শ্রাবণ আতাল মাতাল ঝাপসা করে দৃষ্টি।

পাগল-করা বৃষ্টি ওরে, পাগল-করা বৃষ্টি !
বসন্তের ই মদন এসে
ভস্ম হ'লো গ্রীষ্মে শেষে,
বর্ষা রাতে কাঁদলো রতি
অনঙ্গের-ই লক্ষ্মী-সতী,
বিশ্ব ধরা উঠলো কেঁপে, অশ্রুভরা সৃষ্টি।
পাগল-করা বৃষ্টি, ওরে পাগল-করা বৃষ্টি !

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

শূন্যস্থানগুলি ঠিকমত পূর্ণ করলে লেখাটি এই রকম হবে ঃ

কালকের **ডাকে মধু**বনী থেকে **খবর** এসেছে **মে মা**সের **নয়** তারিখে **মধুদার** বিয়ে, **বেশ ঘটা** করেই হবে। আমাদের স**কল**কে **বর**যাত্রী যেতে হবে। বিয়ে তো **নয়, মার** ভাষায় **দার** পরিগ্রহ। কা**রণ** এ বিয়ে **ঘটা**নো **হয়**তো খুব সহজ **হয়** নি। **বারে** বারেই তো হতে হতে ভেঙ্গে গেছে! যাই হোক, **পত্র**পাঠ **উত্তর** দিয়ে দেওয়া হয়েছে, **তে**সরা বি**কাল** বেলা **কল**কাতা হয়ে **আম**রা যাচ্ছি। যদিও গর**মে গা** দিয়ে ঘাম ঝরবে কিন্তু শাখা**পত্র** দিয়ে ছাওয়া বি**শাল শাল**বনে ঘেরা জায়**গাটি** মনোরম। ভোরে পাখির **ডাকে** ঘুম ভাঙ্গে। তা **ছাড়া উত্তর** দিকের বা**গানে** এ**বারে** প্রচুর **আম** হয়েছে। **বেশ**ভূষা করে **মার** মার করে মা**দল** বাজা**তে** বাজাতে **দল** বেঁধে এ**কেবা**রে **রণ**বেশে হাজির হব, খাঁচা**ছাড়া** পাখির মত **গানে** গানে মাতোয়ারা হয়ে। **কে বা**ধা দেবে?

যাঁরা উত্তর দিয়েছেন ঃ সর্বশ্রী অমিতাভ ও বুলবুল চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা-৪৫); বিশাখা সেনগুপ্ত (বারাণসী); সংযুক্তা শতপথী (ভুবনেশ্বর); প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী (কলকাতা-২৯); জাহানারা বেগম (বহরমপুর); কল্যাণ দত্ত (শান্তিনিকেতন); শ্যামশ্রী দাশগুপ্ত (নিউ দিল্লী); মহানন্দা ও পুনর্ভবা মুখোপাধ্যায় (এলাহাবাদ); রামু, দামু ও নিমাই (নবদ্বীপ); শিখারাণী বসু (হাওড়া-১); তাজপুর হরিশ্চন্দ্র বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ (তাজপুর); সম্বরণ চাটুজ্যে (বারাণসী); খুকু, দেবু, মনীষা ও ছোটবৌদি (বর্ধমান); সীতা রায় (মেদিনীপুর); কল্যাণশ্রী মজুমদার (কানপুর)।

নূতন ধাঁধা

খ ঘ চ জ ক
গ ঙ ছ
———
ঝ খ ঙ গ ক
চ ঙ গ ঝ ক×
গ জ খ ঙ ক×
———————
ঘ ঘ ঘ ঝ গ গ ক

পাশের গুণ অঙ্কটিতে প্রত্যেকটি সংখ্যার বদলে একটি করে অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে। অক্ষরের বদলে সঠিক সংখ্যাটি বসালেই অঙ্কটি বেরিয়ে পড়বে। একই অক্ষরের বদলে প্রতিবার একই সংখ্যা বসাতে হবে। চেষ্টা করে দেখ তো!

বীণা মিত্র-স্মৃতিপুরস্কার-প্রতিযোগিতা

১৩৮৯ সালের নববর্ষ সংখ্যায় ঘোষিত সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বর্গত পত্নী বীণা মিত্র স্মৃতি-পুরস্কার বিচারকদের বিচার অনুযায়ী দেওয়া হবে শ্রীরণদেব গোস্বামীকে। (গ্রাহক নং ৭১৭৬) রচনাটির নাম বাংলাভ্রমণ। এই পুরস্কারটি প্রতি বছরই একবার করে দেওয়া হবে।

সম্পাদক ঃ অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ঃঃ সহযোগী সম্পাদিকা অধ্যাপিকা ডক্টর সুচেতা মিত্র
কার্যালয় ঃ ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলকাতা-৭০০০২৫। টেলিফোন ঃ ৪৭-৩১৮১

স্থাপিত
১৩৩৭ সাল

বিশুদ্ধতার প্রতীক

ভারতের পতাকা মার্কা

ফোনঃ-
৩৫-২৭৭৪

সরিষার তৈল

সর্ব্বত্র সমাদৃত

ভারত অয়েল মিল

২৪৩, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টচার্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ২·০০
ধূমকেতু (বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস) ২·০০
অয়েল পেন্টিং (নাটিকা) ০·৫০

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের

দিগ্বিজয়ী বীর ১·০০

এই বইগুলি এখন আর ছাপা নেই। সামান্য কয়েকখানি ঈষৎ-মলিন অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গেছে। স্টক্ শেষ করে দেবার জন্য উপরিলিখিত অমূল্যে দেওয়া যেতে পারে।

রামধনু কার্যালয়
৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের

ছোটদের সম্ভার – ৩·০০
এতে আছে দু'খানি রহস্য উপন্যাস
পদ্মরাগ ও ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি
হুকাকাশির সব ক'টি গল্পসংগ্রহ
এবং এ ছাড়া আরও কতকগুলি নির্বাচিত
রোমাঞ্চ, রহস্য ও হাসির গল্প

এ ছাড়াও পৃথক্ পৃথক্ পাওয়া যায়
পদ্মরাগ ৮·০০ ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি ৫·০০
হুকাকাশি গল্পসমগ্র ৬·০০ সব সেরা গল্প ৫·০০

প্রকাশক : এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী
এ১৩২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭৩

Regd. No. WB/Sc 41 বার্ষিক পনেরো টাকা প্রতিসংখ্যা ১.২৫ টাকা

সম্প্রতি প্রকাশিত

রামধনু-সম্পাদক

অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের

বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পসংগ্রহ

লুপ্তধন—৮·০০

(এ বছরের শ্রেষ্ঠ ছোটদের বই হিসেবে ফটিক-স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত)

মেঘনাদ—১০·০০

(একাধারে রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক সম্পূর্ণ উপন্যাস)

তুষারলোকের রহস্য—৮·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮।১সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ছোটদের বিশ্বকোষ

ছেলেমেয়েদের সচিত্র বিরাট এন্‌সাইক্লোপিডিয়া

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ও শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

আরও একটি অতিরিক্ত খণ্ড (৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রকাশের আয়োজন চলছে।

১ম খণ্ড (৩য় সংশোধিত সংস্করণ)—কুড়ি টাকা।

৩য় খণ্ড (২য় সংশোধিত সংস্করণ)—ষোল টাকা

৪র্থ খণ্ড (নতুন সংশোধিত সংস্করণ)—আঠারো টাকা।

২য় ও ৫ম খণ্ড (নতুন সংস্করণ)—প্রতি খণ্ড পঁচিশ টাকা

প্রতিটি খণ্ড আলাদা ভাবে কিনতে পাওয়া যায়।

(৩য় খণ্ডও নিঃশেষিতপ্রায়)

মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩